রবিন্‌সন্‌ ক্রুশো

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত
[কলিকাতা গেজেট, ২৩শে মে, ১৯৪০]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

মূল্য এক টাকা চারি আনা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিঃ

স্বত্বাধিকারী ঃ আশুতোষ লাইব্রেরী

৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ,

৭৮।৬, লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা,

নবম সংস্করণ

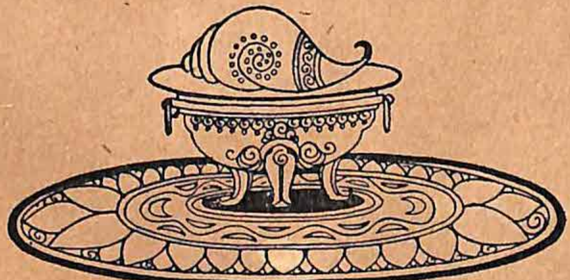
১৩৫৬

মুদ্রাকর—শ্রীললিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

৮৯, লেক রোড, কলিকাতা

উপহার



সূচীপত্র



খড়কুটা একত্র করিয়া আগুন জালিলাম [পৃঃ ৬৫

(মুখপত্র)

রবিন্‌সন্ ক্রুশো

প্রথম অধ্যায়

—:(*):—

নিরাশ্রয়

ছেলেবেলা সকলেই দুষ্টু থাকে, আমিও দুষ্টু ছিলাম। বুদ্ধি এখন যাহাই থাকুক্ না কেন, বিদ্যায় ছিলাম আমি প্রায় "গডাচর ডিগ্‌গজ্"। সেজন্য বাবার কাছে যে কত গালি খাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিশুকালে তিনি বড় আদর করিয়া আমার নাম রাখিয়াছিলেন—'রবিন্‌সন্ ক্রুশো'। বোধ হয় তাঁহার কোন বিশ্বাস ছিল যে, 'রবিন্‌সন্ ক্রুশো' নামের পরে ব্যারিষ্টার বা উকীল, কিংবা ঐরকমই একটা কিছু জুড়িয়ে দিলে বেশ্ মানাইবে। সুতরাং, তিনি আমাকে আইন পড়াইবার জন্য বিশেষ ভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে আমার একেবারেই

ঝোঁক ছিল না। পুঁথি-পত্তর যেখানে থাকিত, আমি তাহার আশে-পাশেও সহজে ঘেঁসিতাম না।

আমার হালচাল দেখিয়া বাবা ভারী দুঃখিত হইতেন। তিনি নানারকম উপদেশ দিয়া আমাকে 'সুশীল ও সুবোধ বালকটি' তৈয়ার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আমার উচ্ছৃঙ্খলতা যেন ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল।

সকলে যখন পড়াশুনায় ব্যস্ত, আমি তখন সমুদ্রের ধারে কোন উঁচু পাথরের উপর বসিয়া সমুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য দেখিতাম। বড় বড় জাহাজগুলি ঢেউএর তালে তালে মোচার খোলার মত কেমন হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে থাকে, তাহা দেখিতে দেখিতে আমি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতাম! ক্ষুধাতৃষ্ণা বাড়ী-ঘরের কথা মনে হইত না, কোন এক স্বপ্নরাজ্যের দিকে আমার উন্মত্ত প্রাণ আকুল ভাবে ছুটিয়া যাইত।

এক দুই করিয়া মিনিটের পর মিনিট যাইত, ঘন্টার পর ঘন্টা চলিয়া যাইত। জাহাজগুলি ধীরে ধীরে কোথায় অদৃশ্য হইত, কিন্তু সকলের অগোচরে তাহারা আমার হৃদয়পাতে কি যে একটা গভীর দাগ কাটিয়া যাইত, তাহা কে জানে?

ক্রমশঃ আমার সেই প্রাণের দাগ যেন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল—একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ঐরকম ভাবে জাহাজে চড়িয়া দেশ-বিদেশ বেড়াইবার একটা সখ আমার বুকের মাঝে প্রবল হইয়া উঠিল—সমুদ্র-যাত্রার জন্য আমি পাগল হইলাম।

বাবা ও মা আমাকে কত বুঝাইলেন,—কত রকম বিপদের ভয় দেখাইয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কাঁধে আমার শনিগ্রহ, কাজেই প্রাণ আমার কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। সমুদ্র যেন রং-বেরঙের শোভা লইয়া তাহার উচ্ছ্বাসময় লক্ষ লক্ষ হাত তুলিয়া আমাকে ব্যাকুলভাবে ডাকিতে লাগিল। দিবারাত্রি—শয়ন-স্বপনে আমি তাহাই অনুভব করিতে লাগিলাম। নিশীথে ঘুমের ঘোরেও আমি চীৎকার করিয়া উঠিতাম—"সমুদ্র! সমুদ্র!"

সুযোগের অভাব ছিল অনেকদিন। কারণ, মা ও বাবা দিনরাত আমাকে চোখে চোখে রাখিতেছিলেন। যাহোক্, অবশেষে সেই সুযোগও জুটিয়া গেল।

একবার 'হাল্' নামক বন্দরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, সেখান হইতে এক জাহাজ সেইদিনই

লণ্ডন সহরে যাইতেছে। মা-বাবা কাছে নাই—সুতরাং, আমাকে বাধা দেওয়ার কেহই ছিল না। আমি এই সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। আশৈশব যে আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছি,—আজ হাতের কাছে তাহা উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়া আমি কি অবহেলায় তাহা নষ্ট করিতে পারি? সুতরাং আমি সেই জাহাজে দিব্যি মনের সুখে চাপিয়া বসিলাম। মা-বাপ, বাড়ী-ঘর—কিছুই আর মনে রহিল না। ঢেউএর তালে নাচিতে নাচিতে আমাদের জাহাজ সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল।

বেশী দূর যাইতে হইল না। মা-বাপের প্রাণে কষ্ট দিয়া আসিয়াছি—এখন তাহার শাস্তি আরম্ভ হইল। আকাশের এককোণে একখণ্ড কালো মেঘের উদয় হইল।

ছোট্ট সেই মেঘ ক্রমশঃ বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া সমস্ত আকাশখানি ছাইয়া ফেলিল। সমুদ্রের নীল জলে কালো মেঘের ভীষণ শোভা ফুটিয়া উঠিল। তাহার অতল বুকে উত্তাল তরঙ্গের সূচনা দেখা দিল।

অল্পকালের মধ্যেই পর্ব্বত-প্রমাণ ঢেউ লইয়া সমুদ্র ফুঁসিয়া উঠিল। ঢেউএর আবর্ত্তে পড়িয়া আমাদের

বিশাল জাহাজখানি খোলার নৌকার মত উলট্‌পালট্ হইতে লাগিল।

বিপদের উপর বিপদ্!—হঠাৎ একজন চীৎকার করিয়া কহিল—"বয়া ধর, জাহাজের তলা ফুটো হইয়া গিয়াছে!" সেই সঙ্গে সঙ্গে সকলের কণ্ঠ হইতে একটা গভীর আশঙ্কার শব্দ বাহির হইয়া জাহাজখানিকে যেন আরও অস্থির করিয়া তুলিল।

গল্‌গল্ করিয়া জাহাজে জল উঠিতেছিল—জাহাজ ক্রমশঃই সমুদ্রের কোলে বসিয়া যাইতেছিল। আমরা সকলেই বুঝিলাম, আর মুহূর্ত্তের মধ্যেই জাহাজটি—অতল জলে ডুবিয়া যাইবে। প্রাণের মায়ায় আমরা সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম।

অদূরেই একটি ছোট জাহাজ দেখা গেল—সেই জাহাজের কাপ্তেন আমাদের বিপদ্ বুঝিয়া জাহাজের গা হইতে একটি নৌকা খুলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ক্রমাগত ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করিয়া নৌকাটি আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু অমন ভীষণ ঝড়ের সঙ্গে যুঝিয়া অগ্রসর হওয়া সামান্য একটি নৌকার পক্ষে বড় সহজ কথা নয়! কাজেই জাহাজের গায়ের পাশে তাহা কিছুতেই ভিড়িতে পারিতেছিল না।

অবশেষে আমাদের জাহাজ হইতে একটি দড়ি ছুঁড়িয়া দেওয়া হইল। নৌকাটি—সেই দড়ি ধরিয়া জাহাজের গায়ে আসিয়া লাগিল, আমরা তাহাতে উঠিয়া বসিলাম।

অল্পের জন্য বাঁচিয়াছি বলিতে হইবে। কারণ, আমরা নৌকায় উঠিবার অল্প পরেই জাহাজটি একেবারে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়া গেল। অত বড় জাহাজ—তাহার আর কোন চিহ্নও রহিল না! যাহোক্, সকলে মিলিয়া দাঁড় ঠেলিয়া কোনরূপে তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভগবান্‌কে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিলাম।

আমি তখন সবেমাত্র আঠারো বছরের ছেলে। এই বয়সেই সমুদ্র-যাত্রার জন্য অতটা পাগল এবং বাপ-মাকে না বলিয়া পলাইয়া আসিয়াছি শুনিয়া অনেকেই আমাকে খুব তিরস্কার করিল। জাহাজের কাপ্তেনও আমাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

সে সব উপদেশ আমার কিছুই ভাল লাগিল না। আমি আবার এক জাহাজের কাপ্তেনের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া আর এক নূতন জাহাজে চাপিয়া বসিলাম। কিন্তু বিপদ্ আমার কাঁধের উপরেই ছিল। কিছু দূর যাইতে না যাইতেই একদল জলদস্যু



আমরা নৌকায় উঠিয়া বসিলাম [পৃঃ ৬

আমাদিগকে আক্রমণ করিল। বেশ্ একটা ছোটখাট রকম লড়াই বাধিয়া গেল; কিন্তু সবই বৃথা হইল—আমরা সকলেই তাহাদের বন্দী হইলাম। ডাকাতেরা আমাদিগকে তাহাদের দেশে লইয়া চলিল।

ডাকাতের সর্দ্দার আমাকে দেখিয়া বেশ্ পছন্দ করিলেন। তিনি আমাকে প্রাণে মারিলেন না, কিংবা অন্যত্র বিক্রয়ও করিলেন না। আমাকে তাঁহার নিজের চাকর করিয়া রাখিয়া দিলেন এবং আর সকলকে বিক্রয় করিবার জন্য নানাদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই আমি সর্দ্দারের খুব বিশ্বাসী চাকর হইয়া পড়িলাম; তিনি আর কোন বিষয়েই আমাকে সন্দেহ করিতেন না। আমিও নিজের অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট, এইরকম ভাব দেখাইয়া চলিতে লাগিলাম। এইভাবে—দিন যাইতে লাগিল।

একদিন আমার মনিবের আদেশে আমি একটি নৌকা লইয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে গেলাম। একটি ছেলে ও একটি চাকর আমার সঙ্গে চলিল। মুক্ত সমুদ্রের উদার বক্ষে নৌকা ভাসাইতেই আমার প্রাণে যেন কিসের একটা আশা জাগিয়া উঠিল—স্বাধীনতার লোভে আমি কতকটা চঞ্চল হইয়া পড়িলাম।

একটু একটু করিয়া আমরা ক্রমশঃ অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িলাম। সমুদ্রের হিল্লোলে আমাদের ক্ষুদ্র নৌকাখানি হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল,—আমার বুকটাও একবার নাচিয়া উঠিল। মুক্তিলাভ করিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম।

সহসা ঝাঁ করিয়া আমি চাকরটিকে একটা ধাক্কা দিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলাম। পড়িতে পড়িতে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল এবং তখনই আবার সাঁতার কাটিয়া নৌকায় উঠিবার চেষ্টা করিল।

আমি উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিলাম— "খবর্দ্দার! নৌকার দিকে আসিও না। তুমি ভাল সাঁতার কাটিতে জান, তীরের দিকে ফিরিয়া যাও, প্রাণে বাঁচিবে। নতুবা এদিকে আসিবার চেষ্টা করিলেই—এই দেখ পিস্তল—গুলিভরা পিস্তল—এক মুহূর্ত্তে তোমার মাথার খুলি উড়াইয়া দিব।"

সে বেচারা—অগত্যা তীরের দিকে সাঁতরাইতে লাগিল। সঙ্গী ছেলেটি এসব ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকেও কর্কশকণ্ঠে কহিলাম— "জুরী! একজনের পরিণাম দেখিয়াছ। বুঝিয়া আমার কথামত চলিও। নতুবা, একটি গুলিতে



ধাক্কা দিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলাম [পৃঃ ৮

তোমারও মাথাটি একেবারে ছাতু করিয়া দিব।" জুরী কোন উচ্চ-বাচ্য করিল না। বুঝিলাম, সে অবাধ্য হইবে না।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজগুলি শেষ করিয়া আমরা তীরের বিপরীত দিকে—সমুদ্রের মধ্যে—নৌকা চালাইয়া দিলাম। খবর পাইয়া ডাকাতের সর্দ্দার যদি আমাদের অনুসরণ করে, আমাদিগকে ধরিবার জন্য যদি সে তাহার জাহাজ লইয়া অগ্রসর হয়, ইহা ভাবিয়া আমি বড়ই অস্থির হইয়া পড়িলাম। প্রাণপণে নৌকা চালাইয়া দিলাম, আর একমনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলাম—"দয়াময় পরমেশ্বর! আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই অনন্ত সমুদ্রে কাহাকেও পাঠাইয়া দেও!"

হঠাৎ জুরী চীৎকার করিল—"ঐ, ঐ একখানি জাহাজ দেখা যায়!" সত্যই দেখিলাম বহুদূরে একটি জাহাজ বাতাসের মত ছুটিয়া চলিয়াছে।

জুরীকে শক্ত করিয়া হাল ধরিতে বলিয়া আমি নৌকার ছাদের উপর উঠিলাম এবং আশা, আনন্দ ও উৎকণ্ঠার সহিত একটি কাপড় উড়াইয়া সঙ্কেত করিতে লাগিলাম। ভগবানের কৃপায় আমার পরিশ্রম বৃথা

হইল না। জাহাজের কাপ্তেন আমার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিয়া আমাদের দিকে জাহাজ চালাইয়া দিলেন। কাপড়ের নিশান উড়াইতে উড়াইতে আমরাও জাহাজের কাছে উপস্থিত হইলাম। জাহাজের সকলেই আমাদিগকে অতি আদরের সহিত তুলিয়া লইল।

আমার রক্ষাকর্ত্তা কাপ্তেনের কাছে আমি কিছুই গোপন করিলাম না। আমি যে ডাকাতের হাত হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, তাহাও বলিলাম। কাপ্তেনও আমার মুক্তিতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

জুরীর অল্পবয়স ও ফুট্‌ফুটে চেহারা দেখিয়া কাপ্তেন তাহাকে বড়ই পছন্দ করিলেন। তিনি তাহাকে নিজের চাকরভাবে রাখিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং বলিলেন যে, জুরী যদি খুব বিশ্বস্তভাবে কাজ করিতে পারে, তবে ভবিষ্যতে কাপ্তেন তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবেন।—জুরীর ইহাতে কোন আপত্তি হইল না, সুতরাং আমিও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

জাহাজ এক বন্দরে আসিল। আমি সেখানে নামিয়া রহিলাম। জুরী কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজেই রহিয়া গেল।

বন্দরে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য আমার পিতামাতার



কাপড়ের নিশান উড়াইতে উড়াইতে···উপস্থিত হইলাম . [পৃঃ ১০

কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের ভালবাসা ও আদর-যত্নের কথা মনে পড়িয়া একটু ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু সেই ব্যাকুলতাও আমাকে আমার বাড়ীর দিকে নিতে পারিল না। আমি আবার এক জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়া লইলাম এবং তাঁহার সঙ্গে আবার সমুদ্র-যাত্রায় বাহির হইলাম।

কোন্ কুক্ষণে রওয়ানা হইয়াছিলাম তাহা জানি না। কিছুকাল বেশ্ নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল; কিন্তু একদিন আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা গেল। ক্রমশঃ তাহা বড় হইয়া চারিদিক ভয়ানক অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। সমুদ্রের নীল জলগুলি বিষাক্ত সাপের মতন ফুঁসিয়া উঠিল; তাহারা যেন লক্ষ লক্ষ হাত মেলিয়া আমাদিগকে কোন্ অতল গহ্বরে ডাকিতে লাগিল। আমাদের অত বড় জাহাজখানি সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে পড়িয়া সামান্য একটি খড়ের মত হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে লাগিল।

ঝড় ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। পৃথিবী ঝল্‌সাইয়া বিদ্যুৎ চম্‌কাইল, পাতাল কাঁপাইয়া বজ্রপাত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দৈত্যের মত একটা দম্‌কা বাতাস হঠাৎ খুব জোরে জাহাজখানিকে কাঁপাইয়া গেল; সঙ্গে

সঙ্গে একটা পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ তাহার প্রচণ্ড ধাক্কায় জাহাজের কতকটা অংশ চূরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। জাহাজ ডুবিতে লাগিল।

জাহাজের গায়ে কয়েকটি ছোট ছোট নৌকা বাঁধা থাকিত। আমরা তাহারই একটিতে চড়িয়া সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া চলিলাম। কিন্তু আমাদের ঐ সামান্য আশ্রয়টুকুও বোধ হয় বিধাতার প্রাণে সহ্য হইল না। অল্পকালের মধ্যেই তিনি তাহাও কাড়িয়া লইলেন, আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় করিলেন।

নৌকায় চড়িয়া খুব জোরে দাঁড় চালাইয়া আমরা কেবল কয়েক মাইল আসিয়াছি, এমন সময় আকাশে মাথা ঠেকাইয়া একটা পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ আমাদের পেছনে আসিয়া আঘাত করিল। সেই বিপদের সময়ে আমরা ভাল করিয়া চিন্তার অবসর পাইলাম না—মনে-প্রাণে একবার ভগবানকে ডাকিতে পারিলাম না—মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের সেই একমাত্র সম্বল ছোট্ট নৌকাখানিও ডুবিয়া গেল—আমরা অকূল-পাথারে ভাসিলাম।

ছেলেবেলা হইতেই আমি খুব ভাল সাঁতার কাটিতে পারি। কত বার কত সময় খাল, বিল, নদী অনায়াসে

সাঁতরাইয়া পার হইয়াছি। মনে মনে তাই বড় একটা অহঙ্কার ছিল যে, জলে আমার সমকক্ষ লোক খুব কমই আছে। কিন্তু আজ এই বিপদে পড়িয়া আমার সেই অহঙ্কার দূর হইয়া গেল—আমি হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ নাকানী-চুবানী খাইলাম—তারপর একটা প্রকাণ্ড ঢেউ তাহার ভীষণ ধাক্কায় আমাকে সমুদ্রের তীরে চড়ার উপরে ফেলিয়া গেল—প্রাণে একটু আশা হইল; কিন্তু তখনই আর একটা ঢেউয়ের টানে আমি আবার সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। কয়েক সেকেণ্ড পর আবার একটা ঢেউ সজোরে আমাকে সমুদ্রের তীরে ফেলিয়া গেল, কিন্তু তখনই অন্য একটা ঢেউ পুনরায় আমাকে জলের মধ্যে লইয়া গেল। এইভাবে সমুদ্রের ঢেউগুলি যেন আমাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে লাগিল।

তাহাদের সেই ছিনিমিনি খেলার মধ্যে আমি হাতের কাছে একবার একটি পাহাড়ের অংশ নাগাল পাইলাম। 'মরিয়া' হইয়া আমি তাহা আঁকড়াইয়া ধরিলাম। সমুদ্রের পাগ্‌লা ঢেউগুলি আমাকে টানিয়া লইবার জন্য কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করিয়া গেল; তারপর যেন

হতাশভাবে পেছনে হটিয়া গেল। আমি সেই পাহাড়ের গা বাহিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম এবং সমুদ্রের অনেকটা দূরে ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ শরীর একটু সবল হইল—আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গীদের খোঁজ করিতে লাগিলাম; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কেবল দেখিলাম তাহাদের তিনটি টুপী এবং একজোড়া জুতা ভাসিয়া যাইতেছে। হতভাগাদের পরিণাম চিন্তা করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভগবানের কৃপায় যে আমার জীবন ফিরিয়া পাইয়াছি, ইহা ভাবিয়া তখনই জানু পাতিয়া পরমেশ্বরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

একে একে অনেক কথা মনে হইল। ওঃ! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! জগদীশ্বর ব্যতীত আর কে এমন বিপদে রক্ষা করিতে পারেন!—ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল। আমি মনে-প্রাণে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম।

এইসব ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ আমার নিজের সেই সময়ের অবস্থার কথা মনে হইল। আমি আসন্ন

মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি বটে, কিন্তু তবু কি আমি নিরাপদ? পরণে একমাত্র যেটি পোষাক, তাহা একেবারে ভিজা। আর কোন পোষাক জামা নাই। কেবল তাহাই নয়, আমার না আছে এক টুক্‌রা রুটি, না আছে এক ছটাক জল! ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করিবার কিছুমাত্র সম্বল নাই। দু'একটি পাখী শিকার করিয়া খাইব, কিংবা বন্যজন্তুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিব, সে-রকম একটি বন্দুক বা কোন প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রই নাই। সুতরাং, এমন বিনা সম্বলে একাকী এই বিজন স্থানে আমি কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিব? ভাবিতে ভাবিতে আমি পাগলের মত হইলাম—নিজের হাত নিজে রগড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

অমন নির্জ্জন স্থানে চীৎকার করিয়া কাঁদিলে কে তাহাতে সহানুভূতি দেখাইবে? সুতরাং, তাহাতে বিন্দু-মাত্র উপকার হইল না।

ক্রমশঃ রাত্রি হইয়া আসিল। এখন ভয় হইল দিনে সমুদ্রের ভীষণ ঝড় হইতে রক্ষা পাইয়াছি বটে, কিন্তু রাত্রিতে অবশ্যই কোন হিংস্র প্রাণীর আক্রমণে প্রাণ হারাইব, অথবা কোন প্রকারে রাত্রিটা কাটিলেও পরদিন অনাহারে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

যাহোক রাত্রিটা কিপ্রকারে নিরাপদে কাটাইতে পারি, এখন তাহারই চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ একটু ভাল জলের অনুসন্ধান করিয়া রাখিলাম। তারপর পছন্দসই একটা গাছে উঠিয়া রাত্রির জন্য প্রস্তুত হইলাম। ঘুমের ঘোরে পড়িয়া না যাই, সে-রকম ভাবে নিজকে বেশ করিয়া আটকাইয়া লইলাম এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখি চারিদিকে সূর্য্যের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাত্রিতে ভাল ঘুম হওয়ায় শরীর বেশ সুস্থ বোধ হইল। আমি ধীরে ধীরে আমার আশ্রয়স্থান হইতে নামিয়া আসিলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমার চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি গতকল্য পাহাড়ের যে অংশটি ধরিয়া আমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম, আজ তাহারই অতি নিকটে আমাদের ভাঙ্গা জাহাজটি দাঁড়াইয়া আছে! বুঝিলাম যে, জোয়ারের সময় জলের টানে জাহাজটি এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ভাবিলাম, ভাঁটার সময় জল সরিয়া গেলে জাহাজটি নিশ্চয়ই এই শুক্‌না চড়ায় পড়িয়া থাকিবে। তখন বোধ হয় অতি সহজেই আমি আবার জাহাজের

কাছে যাইতে পারিব। আমার ভারী আনন্দ হইল; আমি অধীরভাবে ভাঁটার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

বৈকালে ভাঁটা আরম্ভ হইল। সমুদ্রের জল চড়া হইতে অনেক নীচে নামিয়া গেল। আমি বহু দূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গেলাম; তারপর একটু সাঁতরাইয়া জাহাজের কাছে পোঁছিলাম। প্রথমে কিছুক্ষণ তাহাতে উঠিবার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না। অবশেষে হঠাৎ একবার চোখে পড়িল, জাহাজের এক পাশে একটি দড়ি ঝুলিয়া প্রায় সমুদ্রের জল পর্য্যন্ত নামিয়াছে। আমি তাহা ধরিয়া জাহাজে উঠিয়া পড়িলাম!

জাহাজটি একপাশে বাঁকিয়া ছিল, তাই ভিতরের সমস্ত জিনিস নষ্ট হইতে পারে নাই। আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভাল দেখিয়া কতকগুলি বিস্কুট, রুটি, পনীর, চাউল, কাপড়চোপড় এবং হাতুর-বাঁটাল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ও বারুদ-গোলা-বন্দুক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় নানারকম জিনিস একত্র করিলাম। তারপর জাহাজের কতকগুলি কাঠ দড়ি দিয়া বেশ্ করিয়া বাঁধিয়া লইলাম। তখন তাহা একটি ভেলার মত দেখা যাইতে লাগিল। জিনিসপত্র যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই একে একে ভেলায় সাজাইলাম। সেই সঙ্গে দুইটি বিড়াল ও

একটি কুকুরকেও ভেলায় তুলিয়া লইলাম। জাহাজের মধ্যে কেবল ঐ তিনটি প্রাণীই তখনও বাঁচিয়া ছিল!

জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ফুলিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইল। আমি তখন অসংখ্য জিনিসপত্র সহ আমার ভেলা চালাইয়া দিলাম। তীরের কাছে পছন্দমত একটা জায়গায় ভেলাখানি বেশ্ করিয়া আটকাইয়া ফেলিলাম এবং ভাঁটার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

ভাঁটা আসিল—সমুদ্রের জল চড়া হইতে অনেক দূরে সমুদ্রে ফিরিয়া গেল। আমার ভেলাটি শুক্‌না চড়ার উপর আটকিয়া রহিল।

এইরূপে হাতের কাছে নানারকম জিনিসপত্র আনিয়া অবশেষে দেশটি বেড়াইয়া দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। আপদে বিপদে রক্ষা পাইতে পারি, এমন একটা সুবিধা মত স্থানে আমার আড্ডা ফেলিতে হইবে, মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া লইলাম। বেড়াইতে বাহির হইবার সময় সঙ্গে একটি বন্দুক ও পিস্তল এবং একটি বারুদের টিন লইতে ভুলিলাম না। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আমি একটি পাহাড়ের চুড়ায় উঠিলাম। যতদূর দেখা যায় বেশ্ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু চারিদিকে কয়েকটি ছোটখাট পাহাড় ছাড়া আর কোন গ্রাম বা



ভেলা চালাইয়া দিলাম [পৃঃ ১৮

নগর কিছুই দেখা গেল না ; তাহার বহুদূরে চারিদিকেই কেবল সমুদ্র ! বুঝিলাম, আমি কোন দ্বীপে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। ইহার তিন-চারি মাইল পশ্চিমে আরও দুইটি ছোট ছোট দ্বীপ দেখা গেল।

এই ভাবে সেই দেশের একটা মোটামুটি ধারণা লইয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং আমার ভেলা হইতে মালপত্রগুলি তীরে লইয়া আসিতে লাগিলাম। জাহাজের পাল ও বাক্সপেঁটরা দিয়া ভাল একটি জায়গায় বেশ্ করিয়া তাঁবু খাটাইলাম, তারপর ম্লালপত্রগুলি পরিপাটি করিয়া গুছাইয়া রাখিলাম এবং রাত্রি হইলে মাঝখানে একটি কম্বল বিছাইয়া তাহাতে শুইয়া পড়িলাম।

পরদিন ভেলা লইয়া আবার সেই জাহাজ হইতে আরও অনেক জিনিস আনিলাম। ছোটবড় নানারকম লোহা, পেরেক, স্ক্রু, তক্তা, খন্তা, কুড়াল, দা ইত্যাদি যাহা কিছু ভাল অবস্থায় দেখিলাম, সমস্তই কুড়াইয়া আনিলাম। স্থির করিলাম, জাহাজের সমস্ত জিনিসই লইয়া আসিব। সুতরাং প্রত্যহই সাধ্যমত জিনিসপত্র আনিতে লাগিলাম। এই ভাবে আট-নয় দিন সমানে জিনিসপত্র আনা হইল। দশ দিনের দিন রাত্রিতে ভয়ানক একটা ঝড় হইয়া গেল। পরদিন চাহিয়া দেখি,

জাহাজের চিহ্নমাত্র নাই—ঝড়ের চোটে জাহাজটি চুরমার হইয়া কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে তাহা কে জানে ?

আমার এতদিনের পরিচিত জাহাজটির এই অবস্থা দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। যাহোক্ ইহার পর আমার প্রথম চিন্তা হইল একটি শক্ত বাড়ী তৈয়ার করা। সারা বছর তাঁবুতে থাকিবার চেষ্টা করা বিপজ্জনক, কারণ তাঁবুর ভিতরে অনায়াসে যে কোন প্রাণী প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য সুবিধামত জায়গা খুঁজিতে লাগিলাম।

এক জায়গায় একটা উঁচু পাহাড় আমার নজরে পড়িল। তাহার সম্মুখদিক্‌টা বেশ খাড়া, চেষ্টা করিলেও তাহার গা বাহিয়া কেহ উপর হইতে নামিতে পারে না। উহার তলদেশে একটা গুহার মত গর্ত্ত পাহাড়টির গায়ে ঢুকিয়া গিয়াছে।

আমি পাহাড়ের এই অংশটাকে আমার ঘরের পেছন দিকের দেয়াল করিব মনস্থ করিলাম। সেই অনুসারে ইহার সম্মুখদিকে অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে একটা দাগ কাটিয়া লইলাম। তারপর সেই দাগের বরাবর দুই সারি শক্ত কাঠ পুঁতিয়া গেলাম। প্রত্যেক কাঠের উপরদিক্‌টা বল্লমের মত সরু করিলাম।



বাহিরে যাওয়া-আসার জন্য একখানি মই ব্যবহার করিতাম [পৃঃ ২১

জাহাজ হইতে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে কতকগুলি মোটা তার আনিয়াছিলাম। এইবার সেইগুলির আবশ্যক হইল। সেই তারগুলি ঐ কাঠের খুঁটিগুলির মাঝ দিয়া এঁকিয়া বেঁকিয়া টানিয়া লইলাম। তাহাতে ঐ সমস্ত জিনিসটা একটা বুনট-করা বেড়ার মত হইয়া গেল। এই বেড়া তখন এমন শক্ত হইল যে, শত চেষ্টা করিলেও কেহ তাহা ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিতে পারে না। ইহার পর একখণ্ড ত্রিপল-কাপড় দিয়া ঐ ঘেরাও জায়গার উপরদিক্‌টা ঢাকিয়া দিলাম এবং তাহার ভিতরে আমার সমস্ত জিনিসপত্র আনিয়া গুছাইয়া রাখিলাম। সর্ব্বদা বাহিরে যাওয়া-আসার জন্য একখানি মই ব্যবহার করিতাম, কপাট একখানিও রাখিলাম না। এইরূপে বহু পরিশ্রমে সেই নির্জ্জন দ্বীপে বাস করিবার জন্য একটি দুর্গ-প্রস্তুত করিলাম।

কাছেই একটি ঝরণা ছিল। সেই ঝরণার জল যেমন পরিষ্কার, তেমনই সুস্বাদু। সুতরাং, পানীয় জলের কোনও চিন্তা রহিল না। প্রত্যহ বৈকালবেলা আমি আমার বন্দুক ও কুকুর লইয়া শিকার করিতে পাহাড়ের উপর যাইতাম এবং রোজই দু'একটি পাখী শিকার করিয়া লইয়া আসিতাম ; ঐ সকল পাখীই ছিল

আমার প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। আমার সেই আপন-হাতে গড়া দুর্গে বসিয়া আমি যখন শিকার-করা পাখী ও ঝরণার জল দিয়া ক্ষুধার জ্বালার নিবৃত্তি করিতাম, তখন কিছুকালের জন্য আমি আমার নিঃসহায় অবস্থার কথা ভুলিয়া যাইতাম,—আমার মনে হইত আমি এখন বেশ্ সুখী ও সম্পূর্ণ নিরাপদ্!

দ্বিতীয় অধ্যায়

নূতন সংসার

হাবুডুবু খাইয়া আমি প্রথম যেদিন এই বিজন দ্বীপে পদার্পণ করি, সেই তারিখটি আমার বেশ মনে আছে। সেদিন ছিল ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর। কয়েক-দিন পরেই আমার একটা ভয় হইল যে, এখানে যখন পুঁথি-পত্তর বা দোয়াত-কলমের নামগন্ধও নাই, তখন এমন অবস্থায় সপ্তাহের কোনদিন যে রবিবার তাহা হয়ত আমার খেয়ালই থাকিবে না—আমি হয়ত একেবারেই তাহা ভুলিয়া যাইব; সুতরাং ইহা মনে রাখিবার জন্য একটা উপায় বাহির করিলাম।

আমি একটি কাঠের টুকরা লইয়া তাহাতে বেশ্ বড় বড় অক্ষরে লিখিলাম, "১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে আমি এখানে আসিয়াছি।" তারপর সেই কাঠখানাকে আমার তাঁবুর বাহিরে আর একটি উঁচু কাঠের সহিত ক্রুশের আকারে আটকাইয়া দিলাম। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই প্রত্যহ ঐ উঁচু কাঠখানার গায়ে আমি এক-একটি দাগ কাটিয়া যাইতাম। এক

সপ্তাহ গেলেই দাগটি একটু লম্বা করিয়া দিতাম, তারপর একমাস পার হইলেই দাগটি আরও বড় করিয়া দিতাম। এই ভাবে আমি আমার সারা বছরের মাস ও তারিখের হিসাব ঠিক্ রাখিতাম।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আমি এখন প্রত্যহ শিকার ধরিয়া তাহা দিয়া আমার প্রাণধারণ করি; কিন্তু একটি টেবিল-চেয়ার না থাকায় মাঝে মাঝে বড়ই অসুবিধা বোধ হইত। অবশেষে সেই অসুবিধা দূর করিতে মনস্থ করিয়া কুড়াল দিয়া একটি গাছ কাটিলাম। অতিকষ্টে চাঁছিয়া তাহাতে একটি পাতলা তক্তা তৈয়ার হইল। এইরূপে কয়েকটি তক্তা কাটিয়া জাহাজ হইতে আনীত অন্যান্য কাঠের সাহায্যে আমি একখানি টেবিল ও চেয়ার প্রস্তুত করিলাম। একদিন দেখি, নানা জিনিসের সঙ্গে জাহাজ হইতে কতকগুলি কালীও আমার সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তখন আর টেবিল, চেয়ার, লিখিবার জিনিসপত্র—কিছুরই অভাব বোধ করিতাম না।

এইবার সাংসারিক জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিবার জন্য আমি কতকগুলি থাক্ (শেল্‌ফ্) তৈয়ার করিলাম। তাহা ছাড়া, দেয়ালের গায়েও কতকগুলি কাঠ পুঁতিয়া



টেবিল ও চেয়ার প্রস্তুত করিলাম

[পৃঃ ২৪

দিলাম, তাহাতে আমার বন্দুক ঝুলাইয়া রাখিবার সুবিধা হইল। তারপর মাটি খুঁড়িবার জন্য খুব শক্ত লোহাকাঠ দিয়া একরকম শাবল প্রস্তুত করিলাম। ভবিষ্যতে তাহা দিয়া আমার অনেক কাজ হইত। ক্রমশঃ জিনিস-পত্রে আমার সংসার অনেক বড় হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তখন আর জায়গায় কুলাইত না। তাই ঐ কাঠের শাবল দিয়া আমি আমার দুর্গটির পাহাড়ে' দেয়াল ভিতর হইতে অনেক খুঁড়িয়া ফেলিলাম। তাহাতে জায়গা অনেকটা বাড়িয়া গেল, সুতরাং আর বেশী অসুবিধা হইত না।

একদিন শিকারে যাইয়া আমি একটি ছাগল ধরিয়া ফেলিলাম। ছাগলটির একটি পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রাণে মরে নাই। এই জীবন্ত ছাগলটিকে পাইয়া আমার ভারী আনন্দ হইল; আমি উহাকে খুব আদরের সহিত পুষিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে ছাগলটির পায়ের দোষও আর রহিল না তারপর সে যখন আমার গুহার আশে-পাশে তিড়িং তিড়িং করিয়া লাফাইয়া বেড়াইত, তখন আমার প্রাণে যে কত আনন্দ হইত, তাহা আর কি বলিব!

আর একদিন একটি কাকাতুয়া ধরিয়া ফেলিলাম।

কয়েক মাস পরে সে আমার এত পোষা হইয়া গেল যে, তখন সে ঠিক মানুষের মত আমাকে আমার নাম লইয়াই ডাকিত! এইভাবে কুকুর, বিড়াল, ছাগল, কাকাতুয়া প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী আমার সেই বিজনবাসের সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। ইহাদিগকে নিয়া আমার একপ্রকার সুখেই দিন যাইতে লাগিল।

তখন আর জিনিসপত্রের বিশেষভাবে কোন অভাব বোধ করিতাম না; কিন্তু রাত্রিতে আলোর অভাবটা খুবই অনুভব করিতাম। আলো জ্বালিবার কোন সরঞ্জামই ছিল না, সুতরাং সন্ধ্যার আগেই খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঘরে আড্ডা লইতে হইত। যাহোক্, ক্রমশঃ এই অভাবও দূর হইল।—ছাগলের চর্ব্বিগুলি আমি বেশ্ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। একদিন আগুনের তাপে তাহা গলাইয়া আমারই হাতে-গড়া মাটির বাসনে ঢালিয়া দিলাম। তারপর তাহাতে একটি সরু দড়ি দিয়া পল্‌তা সাজাইয়া লইলাম। ঐ পল্‌তায় আগুন ধরাইয়া দিলাম, আলোতে ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই হইতেই আমার আলোর অভাব দূর হইল। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, সাধারণ মোমবাতির মত ইহাতে অত পরিষ্কার আলো হইত না, একটু মৃদু আলো পাওয়া

যাইত। যাহোক্, তাহাতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধা হইত না।

জাহাজ হইতে অন্যান্য জিনিস আনিবার সময় একথলি শস্য আনা হইয়াছিল। একদিন জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিতে করিতে তাহা আমার চোখে পড়িল; কিন্তু তখন তাহাতে একটি দানাও পাইলাম না, কারণ ইঁদুরে তাহার সমস্ত শস্য খাইয়া ফেলিয়াছিল। যাহোক্, অন্ততঃ থলিটা তো কাজে লাগিবে, ইহা ভাবিয়া দুঃখিত ভাবে ঐ থলিটি আমার তাঁবুর বাহিরেই ঝাড়িয়া ফেলিলাম।

ইহার কিছুদিন পরেই কয়েকবার খুব বৃষ্টি হইয়া গেল। একদিন চাহিয়া দেখি, তাঁবুর বাহিরে কিসের কয়েকটা গাছ উঠিয়াছে। তখনও বেশী লক্ষ্য করিলাম না; কিন্তু ঐ গাছগুলি যখন মাথায় সোনালী রঙ্গের শিষ্ লইয়া বেশ্ ফুলিয়া উঠিল, তখন আমার বড়ই আনন্দ হইল। ভাবিলাম, এই সব গাছ আসিল কোথা হইতে?—হঠাৎ মনে হইল, ওঃ! সেদিন যে থলি ঝাড়িয়া ইঁদুরে-খাওয়া শস্যগুলি ফেলিয়া দিয়াছিলাম, এইগুলি তাহারই ফল! তাহার অধিকাংশই গম,—কয়েকটি ধানের চারাও ছিল।

যথাসময়ে শস্য পাকিয়া উঠিল। আমি সেগুলি কাটিয়া অতি যত্নে রাখিয়া দিলাম। জুন মাসের শেষভাগে ঐ বীজগুলিকে আবার বুনিয়া দিলাম। কিন্তু চতুর্থ বৎসরের আগে আমি তাহাদের ফলভোগ করিতে পারি নাই; কারণ আমার নিজের দোষেই প্রথম বৎসরের ফসল প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঠিক্ সময়ে না কাটায় তাহার অধিকাংশই মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং সে-বৎসরে অতি অল্পই ফসল পাইয়াছিলাম। যাহোক্, চতুর্থ বৎসরে আমি আমার নিজের ক্ষেতের ফসল কতকটা ভোগ করিতে পারিয়াছিলাম। ইহাতে যে আমার কত আনন্দ হইয়াছিল তাহা আর কি বলিব।

একদিন হঠাৎ ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া আমার পাহাড়ে' দেয়াল হইতে কয়েক চাপ মাটি ধ্বসিয়া পড়িল। ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম; সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার নীল জলগুলি যেন ছুটিয়া তীরের দিকে আসিতেছে! আর তাহাতে পাহাড়ের মত উঁচু ভয়ানক ঢেউ! আমার পায়ের তলায় পৃথিবী যেন বন্‌-বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। আমি প্রথমতঃ খুবই ভয় পাইয়াছিলাম; যাহোক্, অবশেষে বুঝিলাম যে, ভূমিকম্প হইতেছে। একটু

পরেই ভূমিকম্প থামিয়া গেল, আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে আমি প্রায় একঘেয়ে জীবন কাটাইতেছিলাম। কারণ, ছাগলের মাংস ও পাখীর মাংস ছাড়া আর কোন নূতনত্ব ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মুখ বদ্‌লাইবার একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন প্রকাণ্ড একটি কচ্ছপ ধরিয়া ফেলিলাম। সেদিন কচ্ছপের উপাদেয় মাংস ও সুমিষ্ট ডিম দিয়া আমার রুচিটার একটু পরিবর্ত্তন হইল—মনে হইল, সেদিন আমার একটি নেমন্তন্ন।

তৃতীয় অধ্যায়

আশার আলো

ইতিমধ্যে আমি একদিন বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। খুব শীত বোধ হইতে লাগিল এবং সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলাম। ইহাতে আমি বড়ই ভীত হইয়া পড়িলাম; কারণ এমন একটি দ্বিতীয় প্রাণী সেখানে ছিল না, যে আমাকে এক গ্লাস জল দিয়াও সাহায্য করিতে পারে।—এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

একদিন বেশ্ ক্ষুধা বোধ হইল। ঘরে খুঁজিয়া দেখি কতকগুলি কচ্ছপের ডিম আছে। তাহাই কোন রকমে পাক করিয়া লইলাম এবং তাহাতেই ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলাম। কিন্তু তখনও শরীর ভাল না থাকায় বড়ই অশান্তির সহিত দিন যাইতে লাগিল।

অন্যান্য জিনিস খুঁজিতে খুঁজিতে সিন্দুকের মধ্যে একদিন একখণ্ড বাইবেল পাইলাম। ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইল। ভাবিলাম, সময়টা কোন রকমে কাটান যাইবে। প্রথমেই একটা পাতা উল্টাইয়া চোখে পড়িল, একটা আশ্বাস-বাণী। তাহাতে লেখা ছিল যে,

বিপদকালে পরমেশ্বরকে ডাকিলে, তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই একটা কথায় আমি অনেক পরিমাণে সাহস পাইলাম। তখনই হাঁটু গাড়িয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে বসিয়া গেলাম। একমনে তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলাম,—সেই নিরাশার মাঝে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম।

সেদিন আমার যে-রকম ঘুম হইয়াছিল, ও-রকম ঘুম আর কখনও হয় নাই। সেই সমস্ত দিন ঘুমাইয়া পরদিন বৈকালে প্রায় তিনটার সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিল। কিন্তু সেই ঘুম সম্বন্ধে আমার এখনও একটা সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমার মনে হয় আমি পরদিনও সমস্ত দিনরাত্রি ঘুমাইয়া তার পরদিন বৈকালে তিনটার সময় উঠিয়াছিলাম; নতুবা, আমার হিসাবে সপ্তাহের মধ্যে একটা দিন কমিয়া যাইবে কেন? অবশ্য, কয়েক বৎসর পরে এই সন্দেহের উদয় হইয়াছিল।

সে যাহাই হউক্, ঘুম হইতে উঠিয়া আমার শরীর খুব সুস্থ ও সবল বোধ করিলাম। মনে হইল, ভগবান্ বুঝি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

সেই নির্জ্জন দ্বীপে আমার প্রায় দশমাস কাটিয়া গেল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই আমার মুক্তির

সম্বন্ধে আমি হতাশ হইতেছিলাম। কারণ আমার পূর্ব্বে যে আর কেহ কখনও সেই দ্বীপে পদার্পণ করিয়াছে, আমার তাহা মনে হইল না। যাহা হউক্ আমার বাড়ীঘর তখন অনেকটা নিরাপদ্। কেহ যে সহজে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া কোন অনিষ্ট করিয়া যাইবে, আমার সে-রকম কোন আশঙ্কা ছিল না। এখন স্থির করিলাম সেই বিজন দ্বীপে আর কোথায় কি পাওয়া যাইতে পারে তাহা দেখিতে হইবে; কিন্তু যেখানেই যাই না কেন, কুকুরটিকে কখনও সঙ্গছাড়া করিব না।

১৫ই জুলাই তারিখে আমি আমার এই কাজ আরম্ভ করিলাম। যেখানে আমার ভেলা লাগাইয়াছিলাম, প্রথমে সেই স্থানে গেলাম। জল তখন অনেক কমিয়া আসিয়াছে; কোন কোন জায়গায় জল নাই বলিলেই হয়। ঐ জলাশয়ের ধারে আমি অনেক মাঠ ও সমতল ক্ষেত দেখিতে পাইলাম। তাহাতে খুব বড় বড় তামাক গাছ জন্মিয়াছিল। সেই সঙ্গে কতকগুলি বুনো আকগাছও দেখিলাম।

পরদিন—১৬ই জুলাই—আমি আবার বাহির হইলাম; সেইদিন আরও অনেক দূরে চলিয়া গেলাম।



"বিপৎকালে পরমেশ্বরকে ডাকিলে তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।" [পৃঃ ৩১

দ্বীপের সেই অংশ কতকটা জংলা বলিয়া মনে হইল। তাহাতে কতকগুলি নূতন জিনিস আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, মাটির উপর অসংখ্য তরমুজ ফলিয়া রহিয়াছে এবং শত শত আঙ্গুরগাছে থোবা থোবা অসংখ্য আঙ্গুর ধরিয়া রহিয়াছে। ফলগুলি দেখিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম, ভাবিলাম আঙ্গুরগুলি শুকাইয়া কিশমিশ তৈয়ার করা যাইবে; তাহা হইলে অকালে—যখন আঙ্গুর পাওয়া যাইবে না—তখনও সুরসাল ফল খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব।

সেদিন আর আমার পাহাড়ে' বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম না—নিকটেই একটা গাছের উপর শুইয়া রাত্রি কাটাইলাম; পরদিন ভোরবেলা আবার অগ্রসর হইলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে এইবার সুন্দর এক ফাঁকা জায়গায় আসিলাম। স্থানটি পশ্চিম দিকে অনেকটা ঢালু। তাহাতে নানারকম ফল ধরিয়া রহিয়াছে। কাছেই এক জায়গায় একটি ঝরণা। তাহা হইতে বেশ পরিষ্কার জল পড়িতেছিল। ভগবান যেন ইহাকে সকল রকম সৌন্দর্য্যে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। স্থানটি আমার বড়ই ভাল লাগিল।

আমি অসংখ্য আঙ্গুর সংগ্রহ করিলাম। তারপর কতকগুলি আঙ্গুর ও তরমুজ সেখানেই স্তূপ করিয়া রাখিলাম; আর কতকগুলি আমার সঙ্গীয় বস্তার মধ্যে পূরিয়া ফেলিলাম। অবশেষে সেই আঙ্গুরের বস্তা ঘাড়ে ফেলিয়া আমার পাহাড়ে' বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। কিন্তু আমি আমার তাঁবুতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অধিকাংশ আঙ্গুর নষ্ট হইয়া গেল। ফলগুলি এত পাকা ছিল যে পথের ঝাঁকুনীতেই তাহাদের সমস্ত রস বাহির হইয়া গেল।

পরদিন আবার যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমার আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। কারণ, দেখিলাম, আগের দিন যে ফলগুলি স্তূপ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই কে নষ্ট করিয়া গিয়াছে! উহাদের অধিকাংশই খাওয়া ও ইতঃস্তত নানাদিকে ছড়ানো। ইহাতে আমি একটু ভয় পাইলাম, কারণ আমার ধারণা হইল যে, নিশ্চয়ই এখানে কোন বুনো জন্তু আছে।

সেদিন আর আঙ্গুর আনিবার চেষ্টা করিলাম না, আঙ্গুরগুলিকে থোবাশুদ্ধ বেশ উঁচু ডালে ঝুলাইয়া রাখিলাম; স্থির করিলাম, রৌদ্রে শুকাইলে তাঁবুতে লইয়া যাইব। কয়েকটা তরমুজ লইয়া ঘরে ফিরিলাম।

ফলের লোভে এই জায়গাটির উপর আমার বেশ্ একটা মায়া হইয়া গিয়াছিল। তাই ধীরে ধীরে আমি এইখানেও একটা বাড়ী তৈয়ার করিয়া ফেলিলাম। কাজেই সহরের বড় বড় লোকের ন্যায় আমারও তখন দুই জায়গায় দুইটি বাড়ী হইল। কিন্তু বাড়ী হইলে কি হইবে? বারোমাস খাইয়া থাকিতে পারি এমন কোন বন্দোবস্ত করা দরকার, কেবল ফলের ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকা আমার সঙ্গত মনে হইল না।

খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলাম, আমার কাছে তখনও কয়েক ছড়া ধান ও কয়েক ছড়া গম রহিয়াছে। তাহার কতকটা পরিমাণ আমি দুইটি বিভিন্ন জায়গায় ছড়াইয়া দিলাম এবং বৃষ্টির অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে বছর তাহার পরে আর বৃষ্টি হইল না, সুতরাং আমার সমস্ত বীজ নষ্ট হইয়া গেল।

যাহা হউক, মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে অবশিষ্ট ধান ও গমগুলি বুনিয়া দিলাম, বৃষ্টি পাইয়া তাহাতে অঙ্কুর গজাইল এবং যথাসময়ে কিছু ফসল ফলিল। কিন্তু প্রথমে কয়েকদিন ছাগল ও খরগোসের উৎপাতে আমার ফসল নষ্ট হইতেছিল; আমি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। অবশেষে আমার বিশ্বাসী কুকুরটিকে

তাহার পাহারায় নিযুক্ত করিলাম। সেই হইতে ছাগল ও খরগোসের উৎপাত কমিয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার এক উৎপাত আরম্ভ হইল। এবার আমার শত্রুতা আরম্ভ করিল একপ্রকার বুনো মোরগ।

কি যে করিব, প্রথমতঃ কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। একদিন ক্ষেতের কাছে যাইয়াই একটা বন্দুকের আওয়াজ করিলাম।

'গুড়ুম' করিয়া শব্দ হইতেই ক্ষেতের মধ্য হইতে **একপাল** মোরগ বাহির হইয়া উড়িয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি তাহাদের দুই-তিনটিকে মারিয়া ফেলিলাম, তারপর সেই মরা পাখীগুলিকে ক্ষেতের উপর একটা কাঠিতে ঝুলাইয়া রাখিলাম। উহাতে ভয় পাইয়া আর কোন পাখী আমার ক্ষেত নষ্ট করিতে আসিত না, আমিও রক্ষা পাইলাম। এইভাবে সেই অল্প কয়েক ছড়া বীজ হইতে সামান্য কিছু ফসল পাওয়া গেল।

উৎপন্ন ফসল এত অল্প যে, তাহাতে খাওয়া-দাওয়া চলিতে পারে না। সুতরাং বর্ষার কয় মাসের জন্য পূর্ব্ব হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক মনে হইল। কিন্তু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিব কোথায়? এমন কোন বাসন-পত্র নাই যাহাতে দুই-এক মাসের খাবার

জমা রাখা যাইতে পারে। মনে মনে এই অসুবিধা বুঝিতে পারিয়া আমি ঝুড়ি তৈয়ার করিতে মনস্থ করিলাম। প্রথমতঃ ইহাতে বড়ই দুর্ভোগ ভুগিতে হইল। কারণ, ঝুড়ি তৈয়ার করিবার জন্য যে সকল লতা ও ছোটখাট ডাল আনিলাম, ইহার অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে একদিন আমার পুরানো বাড়ীর নিকট হইতে কতকগুলি লতাপাতা আনিলাম। বহুকষ্টে সেগুলি দিয়া ঝুড়ি তৈয়ার হইল। তারপর তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইলাম। ইহার পর কোথাও বাহির হইতে হইলেই আমি ঝুড়িটি কাঁধে ফেলিয়া রওয়ানা হইতাম। দেখিতে যদিও ইহা অত্যন্ত বদ্‌খৎ হইয়াছিল, তথাপি ইহাতে আমার কাজ হইত ঢের।

রান্না করিয়া খাইবার সময় আর একটি জিনিসের খুব অভাব মনে হইত। আমার সহিত কড়াই বা এমন কোন শক্ত পাত্র ছিল না, যাহাতে একটু মাংস সিদ্ধ করিয়া তাহার ঝোলের স্বাদ লইতে পারি। সুতরাং, কপালদোষে মাংসের ঝোল আমার কোন দিনই খাওয়া হইত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য নিজেই একটা কিছু তৈয়ার করিব সঙ্কল্প করিলাম।

সমুদ্রের তীরে দ্বীপের মধ্যে বাস করিতেছি, সুতরাং ইচ্ছা করিলেই সহজে মাটি পাওয়া যায় না—চারিদিকে ধূ ধূ করে কেবলই বালি। বালি খুঁড়িয়া অনেক নীচ হইতে মাটি বাহির করিলাম, তারপর তাহাতে জল দিয়া বেশ করিয়া ছানিয়া লইলাম।

জল বা সেইরূপ কোন তরল জিনিস রাখিবার জন্য একটা কুঁজা ও মাংস সিদ্ধ করিবার জন্য একটা কড়াই —এই দুইটি জিনিসের খুব অভাব বোধ করিতাম। এইবার কাদামাটি দিয়া তাহা তৈয়ার করিতে চেষ্টা করিলাম।

প্রথমতঃ কত কুঁজা যে নুইয়া পড়িল, কতই যে পোড়াইবার সময় ভাঙ্গিয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহোক্, অবশেষে বহুপরিশ্রমে আমার চেষ্টা সফল হইল। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রাখিয়া তাহা পোড়াইয়া লইলাম। তখন তাহাতে স্বচ্ছন্দে আমি মাংস সিদ্ধ করিতে পারিতাম।

এইভাবে আরও কিছুকাল কাটিয়া গেল। কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারে আমার পোষাক-পরিচ্ছদ তখন অতি জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যেখানে সেখানে অসংখ্য ছিদ্র তাহাতে অনায়াসে বাতাস খেলিয়া যায়! আর কিছুকাল

এইভাবে গেলে আমাকে কোটপেণ্টের অভাবে ন্যাংটা হইয়া থাকিতে হইবে, ইহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং পোষাকের জন্য মন দিতে হইল।

আমার তাঁবুর নিকটেই অসংখ্য জীবজন্তুর চামড়া শুকানো ছিল। আমি যখনই যাহা শিকার করিতাম তখনই তাহার চামড়া তুলিয়া নিয়া রোদে শুকাইতে দিতাম। এখন সেই চামড়াগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া বদ্‌খৎ একটা পোষাক তৈয়ার করিয়া লইলাম। কোন রকমে তাহাতে একটা টুপীও প্রস্তুত হইল।

মানুষের অভাব-বোধ আরম্ভ হইলে সহজে তাহার নিবৃত্তি হয় না। আমারও অভাবগুলি যেন ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। রোদ-বৃষ্টিতে ঘুরিবার জন্য একটি ছাতার অভাব বোধ করিতেছিলাম, অতিকষ্টে একটি ছাতাও প্রস্তুত করিলাম। সাধারণ ছাতার ন্যায় তাহাও ইচ্ছানুসারে খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারিতাম। এইরূপে আমার অভাবগুলি একে একে অনেকটাই দূর হইল।

সন্ধ্যার সময় আমি যখন সেই অপরূপ পোষাকে সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে আসিয়া বসিতাম, তখন আমার মনে মুহূর্ত্তের মধ্যে কত অতীত কাহিনীর উদয় হইত! মনে হইত, এই একই সমুদ্র আমার এই

দ্বীপের নীচে দিয়া বহিয়া যাইতেছে, আবার আম -
জন্মভূমির নীচ দিয়াও ইহাই বহিয়া যাইতেছে! সুত
আমার প্রিয়তম জন্মভূমি ও এই বিজন দ্বীপ একই বাঁ ন
আবদ্ধ। কিন্তু তবু আমার ও আমার জন্মভূমির মধ্যে যে
কত হাজার হাজার মাইল পার্থক্য কে তাহা
করিবে? আর কখনও সেখানে যাইতে পারিব কিনা
তাহা কে জানে?

সমুদ্রের তীরে বসিয়া এইরকম কত কথা চিন্তা করিতাম, আর দূরে—অপর পারে—আর এক দেশের ছবি দেখিতে দেখিতে সেইখানে যাইবার জন্য আমার প্রাণটা যেন কেমন হইয়া উঠিত! ভাবিতাম, একটি নৌকা পাইলেই ঐ দেশে যাইতে পারি; আর যাতায়াতে পথে ঘাটে হয় ত একদিন আমার কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হওয়াও অসম্ভব নহে। এইরূপে আমার মুক্তির পথও খুলিয়া যাইতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে একটি নৌকার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। কেমন করিয়া নৌকা গড়িব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। অবশেষে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া প্রকাণ্ড একটি গাছের গুঁড়ি খুঁদিয়া একটি ডোঙ্গা নৌকা প্রস্তুত করিলাম।



অতি কষ্টে একটি ছাতাও প্রস্তুত করিলাম [পৃঃ ৩৯

নৌকা তৈয়ার হইল—কিন্তু একা আমার পক্ষে ইহাকে জলে ভাসান অসাধ্য মনে হইল। শত চেষ্টায়ও ইহাকে জলের কাছে নিতে পারিলাম না। তখন স্থির করিলাম, ইহাকে যদি জলের কাছে নিতে না পারি, তবে জলকেই ইহার কাছে আনিতে হইবে। মনে মনে ইহা ঠিক করিয়া সমুদ্রের দিক হইতে মাটি কাটিতে কাটিতে খালের মত করিয়া, নৌকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

দিন নাই—রাত্রি নাই—অবিরাম পরিশ্রম করিতে লাগিলাম। অন্য সময় হইলে অত পরিশ্রম করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ! কিন্তু তখন আমার কাজ করিবার শক্তি হাজার গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। কারণ, সেই বিজন দ্বীপে নির্ব্বাসন ভোগ করিয়া আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। নৌকা ভাসাইতে পারিলে আমার মুক্তির পথ কতকটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে—এই আশায় আমি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলাম। আমার মনের কোণে আশার আলো তখন রঙীন ছটায় উঁকি-ঝুঁকি দিতেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

বিজন দ্বীপের মহারাজ

মনে প্রাণে ভগবান্‌কে ডাকিয়া পরিশ্রম করিলে তাহা সফল হইয়া থাকে। আমিও তাহা বেশ্ বুঝিতে পারিলাম। বহু পরিশ্রম করিয়া অবশেষে—আমি আমার নৌকাটি সমুদ্রে ভাসাইলাম—পরমেশ্বর আমাকে সফল করিলেন।

তখন প্রথমতঃ নৌকায় চড়িয়া দ্বীপের চারিদিক একবার ঘুরিয়া আসিবার মতলব হইল। এতদিন আমি দ্বীপের কেবল এক অংশেই আবদ্ধ ছিলাম এবং সেখানে নানারকম আবিষ্কার করিতেছিলাম। কিন্তু দ্বীপের অন্যান্য অংশে যে কি কি জিনিস আছে, সে বিষয়ে আমার একেবারেই কোন ধারণা ছিল না। নৌকায় চড়িয়া তাহা দেখিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইল।

বেশ্ করিয়া নৌকাটি সাজাইয়া লইলাম। মাস্তুল পাল ও দাঁড়—কিছুরই অভাব রহিল না। তারপর একটা বাক্সে করিয়া কিছুদিনের জন্য আমার খাবার,

বারুদ ও গোলাগুলি তাহাতে উঠাইয়া লইলাম। বিপৎকালে দরকার হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া বন্দুকটি আমার সঙ্গেই লইলাম।

সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর সেই দ্বীপের এক অংশে কাটাইয়া আজ ষষ্ঠ বৎসরে—নবেম্বর মাসে আমি আবার সমুদ্র যাত্রায় বাহির হইয়াছি। দ্বীপের চারিদিকটা ঘুরিয়া আসিব, ইহাই হইল আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বীপটি যে খুব বড় তাহা নহে। তবু সেটিকে একবার ঘুরিয়া আসা নিতান্ত সহজ ব্যাপার ছিল না। কারণ, প্রথমেই আমি একটি মস্ত বাধা পাইলাম। দেখিলাম, দ্বীপের পূবদিকে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় সমুদ্রের ধার দিয়া প্রায় ছয়মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তাহাদের কোনটার মাথা জলের উপর, কোনটার মাথা জলের নীচে। সেগুলি যে কত ভয়ানক বিপজ্জনক, তাহা ভাবিতেই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সুতরাং, সমুদ্রের ভিতর দিকে প্রায় ডবল জায়গা ঘুরিয়া যাইতে হইল।

তীরের দিকে একরকম অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। আমি নৌকাটি নঙ্গর করিয়া একটা উঁচু পাহাড়ে উঠিলাম এবং সমুদ্রের অবস্থা

কোথায় কি-রকম তাহা দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, দ্বীপের পূবদিকে একটা জায়গায় ভয়ানক স্রোত! সেই স্রোতের মধ্যে পড়িলে সাধ্য কি যে কেহ আর সহজে উদ্ধার পায়?

সকাল বেলা সমুদ্র যখন অনেকটা শান্ত, তখন আমি আমার নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ বেশ্ নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। কিন্তু মূহূর্ত্তের মধ্যে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কারণ, সমুদ্রের সেই ভীষণ স্রোতের টানে আমার নৌকাটি তীরের মত বেগে ভাসিয়া চলিল; আমি প্রাণপণে নৌকার হাল চাপিয়া ধরিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। নৌকাটি ক্রমশঃই সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিল।

আমার বাঁ দিকে অল্প জল-বিশিষ্ট সমুদ্রের চড়া—তাহাতে অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাইতেছিল। আমি নৌকাটিকে যথাসাধ্য সেই দিক ঘেঁসিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। বেলা যখন প্রায় দুপুর, তখন বাতাসের গতি কতকটা মৃদু হইয়া আসিল—সমুদ্রের স্রোতেও একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল।

জলের স্রোত তখন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, জলের চেহারাও তখন অনেকটা নূতন। স্রোতের মধ্যে

এতক্ষণ যে জল দেখিতেছিলাম তাহা ছিল খুব ঘোলা; কিন্তু স্রোত কমিবার সঙ্গে সঙ্গে জল অনেকটা স্বচ্ছ বলিয়া মনে হইল।

কিছুক্ষণ পরে আবার একটু জোরে বাতাস বহিল; কিন্তু এবার আর আশঙ্কার কিছু ছিল না। কারণ, এই বাতাসে আমার বেশ সুবিধা হইয়া গেল। আমি উত্তর-পশ্চিম দিকে চড়ার কাছে যাইতে লাগিলাম। যতই চড়ার কাছে যাইতেছিলাম, স্রোত ততই কম বোধ হইতেছিল। অবশেষে প্রায় এক ঘন্টার মধ্যে তীর পাওয়া গেল;—আমি তাহাতে নামিয়া পড়িলাম।

যে ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছিলাম, ইহা হইতে যে রক্ষা পাইব, তাহা কখনও ভাবিতে পারি নাই। সুতরাং বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে হাঁটু গাড়িয়া পরমেশ্বরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইলাম; তারপর নৌকাটিকে কোন নিরাপদ্ জায়গায় রাখিবার জন্য স্থান খুঁজিতে লাগিলাম। সমুদ্রের ধার দিয়া তিন-চারি মাইল হাঁটিতে হাঁটিতে আমি এক জায়গায় একটি নদীর মোহানা দেখিতে পাইলাম। মোহানাটি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে। আমার নৌকা রাখিবার জন্য আমি এই জায়গাটি বেশ্ পছন্দ

করিলাম এবং নৌকাটি এই বন্দরের মধ্যে ভালরূপে বাঁধিয়া রাখিলাম।

চড়াতে কয়েকবার পায়চারী করিয়াই বুঝিলাম যে, আমি পায়ে হাঁটিয়া আরও অনেকবার এখানে আসিয়াছি। এবং ইহা আমার বাগান-বাড়ী হইতে বেশী দূর নহে। কেবল সমুদ্রের ধার দিয়া ঐ পাহাড়গুলি ঘুরিয়া আসিতেই আমার এত সময় লাগিয়াছে। যাহোক্ নৌকা হইতে আমার ছাতা ও বন্দুকটি লইয়া আমি রওয়ানা হইলাম। এবং শীঘ্রই আমার বাগান-বাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পরিশ্রমে বড়ই কাতর হইয়াছিলাম, সুতরাং হাত-পাগুলি জুড়াইবার জন্য বেড়ার কাছে এক গাছতলায় একটু সটান হইয়া পড়িলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন অতি নিকটেই আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল—"রবিন্, রবিন্ ক্রুশো! তুমি কোথায়? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

সেই শব্দ শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। ঘুমের ঘোরে আমার চোখ দুটি তখনও প্রায় বন্ধ। তবু সেই

আধঘুমন্ত অবস্থায় আমার কানে আবার বাজিয়া উঠিল—
"রবিন্, রবিন ক্রুশো!"

চোখ রগ্‌ড়াইয়া জাগিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, এ তো তবে স্বপ্ন নয়! এই বিজন দ্বীপে কে আমার নাম ধরিয়া ডাকে? এমন পরিচিত কে?

আমি তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিলাম, কিন্তু উঠিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে আর আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখি যে, আমার তোতা-পাখীটি একটি ঝোঁপের উপর বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতেছে—
"রবিন্, রবিন্ ক্রুশো! তুমি কোথায়? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

আমার এই তোতাপাখীটি আমার কাছেই কথা বলিতে শিখিয়াছিল। আমিই তাহাকে ও-রকম কথা বলিতে শিখাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আমার তাহা মনেই ছিল না—তাই অত ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।

যাহোক্, এই তোতাপাখীর ব্যাপার ও আমার সেবারকার সমুদ্র-যাত্রার কথা ইহার পরেও অনেক সময়ই আমার মনে হইত!

ধীরে ধীরে আরও কিছুকাল কাটিয়া গেল—আমি আবার সাংসারিক কাজে মন দিলাম। প্রথমতঃ রুটি

সেঁকিবার জন্য কয়েকটি মাটির বাসন ও রুটি তৈয়ার করিবার জন্য একটি চুলা তৈয়ার করিলাম এবং সেইদিন হইতে আমার রুটি খাওয়া আরম্ভ হইল। আমারই ক্ষেতে উৎপন্ন গম হইতে রুটি প্রস্তুত করিতাম ও আমারই তৈয়ারী রুটি সেঁকিবার বাসনে করিয়া চুলার উপরে তাহা বসাইয়া দিতাম। চুলা হইতে কয়েকখানি জ্বলন্ত কাঠ রুটির আশে-পাশে টানিয়া দিতাম—তাহাতে রুটিগুলি বেশ্ ফুলিয়া উঠিত। এইভাবে অতি সুস্বাদু রুটি প্রস্তুত হইত। কেবল রুটি নহে, মাঝে মাঝে আমি পিঠা তৈয়ার করিয়াও খাইয়াছি।

ছেলেবেলা হইতেই আমার চুরুট খাইবার অভ্যাস ছিল। এই দ্বীপে আসা অবধি চুরুট না পাওয়ায় আমার খুব কষ্ট হইতেছিল। দ্বীপে যদিও তামাক প্রচুর উৎপন্ন হইত, তবু একটি নলের অভাবে আমি তাহা সিগারেটরূপে ব্যবহার করিতে পারিতাম না। এই কষ্ট দূর করিবার জন্য আমি একদিন কাদামাটি নিয়া বসিয়া গেলাম এবং তাহা দিয়া নল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলাম। অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গেল, অবশেষে একটি আমার ব্যবহারের উপযোগী করিলাম। প্রথম যে দিন সেই নল দিয়া চুরুটের মত তামাক



ছাতা ও বন্দুকটি লইয়া রওয়ানা হইলাম [পৃঃ ৪৬

টানিলাম, সেদিন আমার মনে হইল, আমি নিতান্ত একজন যে-সে লোক নই, আমি একজন ছোটখাট বাদ্‌শা!

এই সময় আমার বন্দুকের বারুদ প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল। ইহাতে আমি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম; কারণ, বারুদ ফুরাইয়া গেলে আমার মাংসের জন্য ছাগল-ভেড়া মারিব কিরূপে? সুতরাং, তাড়াতাড়ি একটা উপায় স্থির করিয়া ফেলিলাম।

আমি স্থির করিলাম যে কয়েকটা ছাগল পুষিতে হইবে; তারপর তাদের বাচ্চা হইবে। এইরূপে আমার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যাইবে। সুতরাং ছাগল ধরিবার জন্য তখনই একটা ফাঁদ পাতিয়া ফেলিলাম।

ছাগলগুলি সাধারণতঃ যেখানে চরিতে আসিত সেই জায়গা আমার জানা ছিল। আমি সেখানে বেশ্ বড় করিয়া একটা গর্ত্ত করিলাম। তারপর সেই গর্ত্তের উপর খুব সরু সরু কতকগুলি গাছের ডাল ও লতাপাতা বিছাইয়া দিলাম। নীচে যে একটা গর্ত্ত আছে তাহা কাহারও বুঝিবার যো রহিল না। সেই ডালপালাগুলির উপরে কিছু শস্য ও ধান-চাউল

ছড়াইয়া দিলাম। খানিক পরেই তুইটি বড় ছাগল ও তিনটি বাচ্চা সেই ফাঁদে আটকিয়া গেল। আমি তাহাদিগকে ধরিতেই বড় একটি ছাগল এমন লাফালাফি ছুটাছুটি করিতে লাগিল যে, আমাকে মারে আর কি। ভয় পাইয়া বড় তুইটিকে ছাড়িয়া দিলাম, বাচ্চা তিনটিকে আটক করিলাম।

সেগুলিকে পোষ মানাইতে আমার অনেকদিন লাগিল। যাহোক্, ক্রমশঃ তাহারা আমার বেশ পোষা হইয়া উঠিল; তখন আর আমাকে দেখিয়া কোন ভয় পাইত না। কালক্রমে আমি তাহাদের জন্য একটি পৃথক্ বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিলাম। বেশ্ ঘাস থাকে, এবং তু'একটি ঝরণা বা ছোট্ট নদী থাকে,—এ-রকম একটা জায়গা বাঁশ দিয়া ঘেরাও করিয়া নিলাম; তারপর সেখানে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম। তারপর পেট ভরিয়া ইচ্ছামত ঘাস-জল খাইত, আর তিড়িং তিড়িং করিয়া মনের আনন্দে লাফাইত।

প্রায় দেড়বছরের মধ্যেই আমার ছাগলের পালে বারোটি ছাগল হইল এবং আরো তুই বছরের মধ্যেই সবশুদ্ধ তাহাদের সংখ্যা হইল তেতাল্লিশ। আবশ্যক মত ইহাদের তু' একটিকে মারিয়া আমি আমার মাংসের

কাজ চালাইয়া লইতাম, অন্যগুলি খোঁয়াড়েই আবদ্ধ থাকিত। ছাগলগুলির দুধ দোহন করিয়া যে দুধ পাইতাম, তাহাতেও আমার নানারকম সুস্বাদু খাবার তৈয়ার হইত। তা'ছাড়া রৌদ্রের দিনে আঙ্গুরের ছড়াগুলি বেশ করিয়া শুকাইয়া লইতাম। সেই শুক্‌না আঙ্গুর বা কিশমিশ এবং দুধ ও দুধের তৈয়ারী নানারকম সুখাদ্য খাইতে খাইতে আমি অনেক সময় ভুলিয়া যাইতাম যে আমি কে এবং কোথায় কি ভাবে আসিয়া পড়িয়াছি! ক্ষণিকের জন্য আমি আত্মহারা হইয়া যাইতাম!

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্বেগ ও আতঙ্ক

সেই বিজন দ্বীপে আমি তখন একচ্ছত্র সম্রাট্! আমার রাজত্বে বাধা দিতে পারে, তেমন কেহ সেখানে ছিল না; সুতরাং আমি ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। আমার সংসারে তখন গুটিকয়েক প্রাণী আসিয়া জুটিয়াছিল। একটি ছিল আমার তোতাপাখী। এই জনমানবশূন্য দ্বীপের মধ্যে একমাত্র এই তোতাপাখীটির সঙ্গে আমার যা' কিছু কথাবার্ত্তা চলিত। আর একটি বন্ধু ছিল আমার বিশ্বাসী কুকুর। সে তখন অনেকটা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি আপদে-বিপদে সেই-ই ছিল আমার একমাত্র দক্ষিণ হস্ত। বসিবার সময়ও সে সর্ব্বদাই আমার ডানদিকে বসিত। তাহা ছাড়া আমার আরও দুইটি বন্ধু ছিল, সে দুইটি আমার বিড়াল। তাহারা রোজই আমার পাতের প্রসাদ পাইবার আশায় অতি কাতরভাবে আমার দিকে তাকাইয়া থাকিত।

এই সব সঙ্গীদের মাঝখানে—আমি যখন আমার

টেবিলের সম্মুখে আহার করিতে বসিতাম, তখন মনে হইত আমি প্রকৃতই একজন ছোটখাট সম্রাট্ এবং ইহারা আমার প্রজার দল। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সেই অবস্থায় কেহ আমাকে দেখিলে কখনও না হাসিয়া থাকিতে পারিত না!

যাহোক্, কিছুকাল বেশ শান্তিতেই কাটিয়া গেল। কিন্তু দীর্ঘকাল চুপ্‌চাপ্ থাকিয়া আমার কেমন একটু অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। নৌকাটির সদ্ব্যবহার করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিত; কিন্তু ভয় হইতে লাগিল পাছে আবার কোন বিপদে পড়ি। সুতরাং নৌকার আশা ছাড়িয়া দিয়া পায়ে হাঁটিয়া বেড়ানই নিরাপদ্ মনে করিলাম।

সমুদ্রের ধার দিয়া আমি যখন বেড়াইতে বাহির হইতাম, তখন কেহ দেখিলে নিশ্চয়ই অবাক্ হইয়া যাইত। কারণ, আমি যে কি—ভূত, না মানুষ,—তাহা কেহই আমার সাজপোষাক দেখিয়া ঠিক্ করিতে পারিত না।

আমার গায়ের পোষাকটি ছিল আগাগোড়া ছাগলের চামড়ার তৈয়ারী, মাথায় একটি বদ্‌খৎ রকমের চামড়ার টুপী। কোমরে চামড়ার তৈয়ারী কোমর-বন্ধ। একটা কিছু অস্ত্রশস্ত্র,—তরোয়াল, কুড়াল, কি করাত—তাহাতে

বাঁধা থাকিত। কাঁধের উপর দিয়া নীচের দিকে ঝুলান আর একটি চামড়ার বাঁধন ছিল। তাহার এক সীমায়—আমার বাঁ হাতের নীচে—তুইটি কৌটা ঝুলান থাকিত। তাহার একটিতে থাকিত বারুদ ও অন্যটিতে থাকিত গুলি। বন্দুকটি কাঁধে ঝুলাইয়া লইতাম। কোন কিছু শিকার পাইলে তাহা রাখিবার জন্য পিঠের উপর একটি ঝুড়ি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলাম। রোদ-বৃষ্টি হইতে মাথা রক্ষা করিবার জন্য নিজেই একটি ছাতা তৈয়ার করিয়াছিলাম। ছাগলের চামড়ার তৈয়ারী সেই কিম্ভূতকিমাকার ছাতা দেখিয়া নিজেই না হাসিয়া থাকিতে পারিতাম না, অন্যের কথা আর কি বলিব ?

যাহোক্, শরীরের উপরের অংশ তবু একরকম ঢাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঢাকা ছিল না কেবল পা তুইটি। জুতা মোজা আমার কিছুই ছিল না। সর্ব্বদা বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া রোদের তাপে আমার মুখটি যেন একটু কালো রঙের হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর মুখভরা লম্বা লম্বা দাড়ি-গোঁফ হইয়া আমাকে কতকটা জম্‌কালো বুনো জন্তুর মত করিয়া ফেলিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই ছিল যে, সমস্ত দ্বীপের মাঝে আমি-ই শুধু একটিমাত্র মানুষ। সুতরাং, আমার সেই

বুনো চেহারা কে-ই বা দেখিবে আর কে-ই বা আমাকে ঠাট্টা করিবে ?

একদিন প্রায় দুপুরবেলা আমি সমুদ্রের ধার দিয়া আমার নৌকার দিকে যাইতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ একটা জিনিসের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম !

দেখিলাম, সমুদ্রের ধারে যেখানে পলিমাটির মত বালিগুলি খুব নরম, সেখানে অতি সুস্পষ্টভাবে একটা মানুষের পায়ের দাগ ! মানুষের পায়ের দাগ এখানে কি-রকমে আসিবে ? এই জনমানবশূন্য দ্বীপে আর কাহার পায়ের দাগ হইতে পারে ? তবে কি রাক্ষসজাতীয় কোন অসভ্য লোক সমুদ্রে বেড়াইতে বেড়াইতে স্রোতের টানে বা ঝড়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছিল ?—এই সব নানা চিন্তায় আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। সম্মুখে বাঘ দেখিলে লোকের যেমন অবস্থা হয়, আমারও ঠিক্ তেমনিই অবস্থা হইল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে আমার দুর্গের দিকে ছুটিয়া গেলাম। অমন বিপদের সময় আমার সামান্য আশ্রয়স্থল তাঁবুটিই তখন একমাত্র ভরসা। সুতরাং তাহাকে দুর্গ না বলিলে আর কাহাকে বলিব ?

দুর্গে প্রবেশ করিয়াই আমি চোখমুখ বন্ধ করিয়া

আমার বিছানার উপর উপুর হইয়া শুইয়া পড়িলাম। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কতরকম চিন্তা একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগিল।

আমি ঠিক বুঝিলাম, নিশ্চয়ই অপর কোন লোক এক মুহূর্ত্তের জন্য হইলেও এই দ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে সে গেল কোথায়? পায়ের দাগ ত একটার বেশী দুইটি দেখা গেল না। সুতরাং, কেহ যে দলবল বাঁধিয়া এখানে আসিয়াছিল, সে-রকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই মনে হয়, ঝড় তুফানে কেহ এখানে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার বিপদ্ কাটিয়া যাইবার পরক্ষণেই নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে নিজের অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম। মনে হইল, ওঃ! কি বাঁচিয়া গিয়াছি! দৈবাৎ যদি আমাকে দেখিয়া ফেলিত, তবে কি বিপদ্‌টাই না হইত! মানুষখেকো অসভ্য জাতি—তাহারা কি আর আমাকে দেখিলে জ্যান্ত রাখিত? নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ আগুনে পোড়াইয়া তাহাদের খাবার তৈয়ার করিয়া ফেলিত; এতক্ষণে হয়ত তাহাদের পেটে দিব্যি হজম হইয়া যাইতাম!

সংখ্যায় কম হইলে অর্থাৎ আমার সঙ্গে পারিবে কি না এ-রকম কোন সন্দেহ থাকিলে এতক্ষণে তাহাদের দলবল-শুদ্ধ সকলে মিলিয়া আমার বাড়ীঘর ঘিরিয়া ফেলিত এবং আমাকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাদের কালিয়া তৈয়ার করিত।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার স্রোত আবার অন্য দিকে ঘুরিয়া গেল।—আমার সঙ্গে দেখা না হইলেও আমার বিপদ্ কম ছিল না। কারণ, দৈবাৎ আমার নৌকাটি দেখিলেও তাহাদের খুব সন্দেহ হইত। তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিত, এই দ্বীপে মানুষ আছে। সুতরাং, তখন আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য ঐ মানুষখেকো অসভ্যগুলি উঠিয়া-পড়িয়া লাগিত। অতগুলি লোকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলে আর কয়দিন? আমাকে নিশ্চয়ই তাহারা বাহির করিয়া ফেলিত।

কোন কারণে আমাকে বাহির করিতে না পারিলেও মৃত্যুমুখ হইতে আমার নিস্তার ছিল না। কারণ, আমার পোষা ছাগলগুলি ও শস্যাদি তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত না। তাহারা সব জিনিসপত্র, শস্যাদি ও ছাগলগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিত। কাজেই খাবার অভাবে আমি তখন পেট শুকাইয়া মারা যাইতাম।

এই সব দুশ্চিন্তায় আমি ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিলাম এবং সৌভাগ্যবশতঃ তাহাদের হাত হইতে যে রক্ষা পাইয়াছি তজ্জন্য নিজের অদৃষ্টকে শত শত বার প্রশংসা করিলাম—মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম।

যাহোক্ "সাবধানের মরণ নাই," এই নীতি অনুসারে আমি যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিলাম। কোথাও বাহির হইতাম না—নিজের তাঁবুতেই সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতাম।

একদিন প্রাতঃকালে এই সব নানা অস্বস্তির কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়িল আমার ধর্ম্মশাস্ত্রের একটা উপদেশ—"বিপদের সময় আমাকে ডাকিও, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব।"

চট্ করিয়া তখনই উঠিয়া পড়িলাম এবং মনটাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিবার জন্য আমার বাইবেলখানি টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিলাম। পুস্তক খুলিতেই সর্ব্বপ্রথমে একটা জায়গায় লক্ষ্য পড়িল। সেখানে লেখা ছিল—"ঈশ্বরকে সেবা কর, মনটাকে প্রফুল্ল রাখ। তিনি তোমার মনে শক্তি দিবেন।"

বাইবেলের এই উপদেশ পড়িয়া বাস্তবিকই আমার প্রাণে যেন একটু শক্তি ফিরিয়া পাইলাম।

তখন আমার প্রথমেই মনে হইল, এই পায়ের দাগ হয় ত আমার নিজের পায়ের দাগ। সুতরাং ইহাতে আমার এত ভয় পাইবার কি কারণ আছে ?

ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে একটু সাহসের সঞ্চার হইল এবং আমি পূর্ব্বের ন্যায় বেশ সাধারণ ভাবে আবার দ্বীপের সর্ব্বত্রই যাতায়াত আরম্ভ করিলাম। দুই-তিন দিন চলাফেরার পর আমার সাহস আরও বাড়িয়া গেল এবং আমি নিশ্চিত ধারণা করিলাম যে ঐ পায়ের দাগ আমার নিজেরই হইবে—অন্য কোন লোকের নহে।

আমার এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক কিনা তাহা হাতে হাতে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি আবার একদিন সেই জায়গায় গেলাম; কিন্তু ঐ দাগের উপর আমার পা মিলাইয়া দেখিলাম যে, আমার পা উহা অপেক্ষা অনেক ছোট। তখন আর ঐ পায়ের দাগ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রহিল না। আমি বেশ স্পষ্টই বুঝিলাম যে, আমার দ্বীপে নিশ্চয়ই কোন লোক আসিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে আবার একটা ভয় উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগিল।

আত্মরক্ষার জন্য খুব যত্ন করা উচিত—মনে মনে

এই সঙ্কল্প করিয়া আমি আমার ঘর-বাড়ীগুলি বেশ শক্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে আমার ঘরের চারিদিকে আর একটা দেওয়াল তুলিলাম এবং তাহাদের মাঝে মাঝে বন্দুকের জন্য ছিদ্র রাখিলাম। জাহাজ হইতে যে ছয়টি বন্দুক আনিয়াছিলাম, সেগুলি ঐ ছিদ্রপথে এমনভাবে রাখিয়া দিলাম যে, আবশ্যক হইলে ভিতর হইতে সবগুলি বন্দুকই যেন একসঙ্গে ছুড়িতে পারি।

এইভাবে দুর্গ তৈয়ার করিয়া তাহার চারিদিকে কতকগুলি ছোট ছোট গাছ পুতিয়া দিলাম। কালক্রমে সেগুলি এমন ঘন হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেহই তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত না। বাহিরে যাতায়াতের জন্য আমাকেও মই ব্যবহার করিতে হইত; কিন্তু তাহা কাহারও লক্ষ্য করিবার উপায় ছিল না।

এখন চিন্তা হইল আমার ছাগলগুলির জন্য। এক জায়গায় থাকিলে পাছে কেহ একদিনেই সবগুলি চুরি করিয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কায়, আমি তাহাদিগকে রাখিবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি খোঁয়াড় তৈয়ার করিলাম এবং সবগুলি খোঁয়াড়েই কয়েকটি করিয়া ছড়াইয়া রাখিলাম। এখন এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম যে, আমার এক খোঁয়াড়ের ছাগলগুলি কোনরকমে

চুরি গেলেও অন্যগুলি বাঁচিয়া যাইবে ; সুতরাং না খাইয়া মরিব না।

এই সময় একদিন জঙ্গলে কাঠ কাটিতে কাটিতে এক জায়গায় একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলাম। সুড়ঙ্গটি মানুষের তৈয়ারী বলিয়া মনে হইল না। আমি ধীরে ধীরে তাহাতে নামিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কতক-দূর যাইয়া দেখি—একযোড়া ঝক্‌ঝকে চক্ষু আমার দিকেই তাকাইয়া আছে! আমি ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলাম, সর্ব্বশরীর প্রায় আড়ষ্ট হইয়া গেল! ছেলেবেলা হইতেই আমি সাহসী বলিয়া বিখ্যাত—তবু সেদিন এমন ভয় পাইয়াছিলাম যে, একলাফে পেছনদিকে হটিয়া আসিলাম!

বাহিরে আসিয়া—নিজের ভীরুতায় নিজের প্রতি ধিক্কার হইল। স্থির করিলাম, ফলাফল যাহাই হৌক্ দেখিতে হইবে ঐ অন্ধকার গুহার মধ্যে ওটা কি! প্রকাণ্ড একটা মশাল জ্বালিয়া লইলাম—তারপর প্রাণের সমস্ত সাহস একত্র জমাট করিয়া আবার গুহার মধ্যে অগ্রসর হইলাম।

সহসা গুহার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মানুষের গলার একটা তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনা গেল। মুহূর্ত্তের

জন্য আমি আবার দমিয়া গেলাম ; কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সামলাইয়া লইলাম। আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ আমার বুকের পাঁজরগুলি কাঁপাইয়া দিয়া গেল! কিন্তু আমি—তবু অসাধারণ সাহসের সহিত আবার অগ্রসর হইলাম। কাছে যাইয়া দেখি—ওঃ হরি!—একটা মুমূর্ষু ছাগল তাহার অন্তিমের শেষ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! বুঝিলাম, আর অল্প সময়ের মধ্যেই সে বেচারার সব শেষ হইয়া যাইবে।

আমি তাহাকে শান্তিতে মরিতে দিয়া সুড়ঙ্গপথে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সুড়ঙ্গটি ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। বাধ্য হইয়া আমাকে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইল। কিছুদূর যাইয়া সুড়ঙ্গটি আবার একটু চওড়া মনে হইল—ছাদটি যেন বেশ উঁচু বলিয়া বোধ হইল। হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলোক আমার চোখ ঝল্‌সাইয়া দিয়া গেল—আমার মনে হইল আমি যেন কোন একটা স্বপ্নপুরীতে উপস্থিত হইয়াছি—বুঝি বা আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। জীবনে অমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই—পৃথিবীর আর কোন প্রাণীও দেখে নাই ইহা ধ্রুব!

দেখিলাম গুহার আশে পাশে চতুর্দ্দিকে কেবল

সোনা, রূপা আর বহুমূল্য পাথর! তাহাদের জ্যোতিতে গুহাটি স্বর্ণ-পুরীর মত রোশনাই হইয়া উঠিয়াছে! বিদেশ-বিভূঁই বিজন দ্বীপে এত দুঃখের মাঝেও ভগবানের এই অসামান্য দয়া দেখিয়া আমার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। তাঁহাকে মনে প্রাণে ধন্যবাদ দিলাম। কারণ তাঁহারই দয়াতে আমি আজ কুবের-ভাণ্ডারের অধীশ্বর!

অল্পক্ষণের মধ্যেই ছাগলটি মরিয়া গেল। আমি তাহাকে কবর দিয়া ফেলিলাম। তারপর আমার ঘর হইতে কিছু গোলাগুলি, বারুদ ও কয়েকটা বন্দুক আনিয়া আমার সেই কুবের-ভাণ্ডারকেও সুরক্ষিত করিলাম।

একদিন খুব ভোরবেলা—সূর্য্য উঠিবার আগে—আমি ইতস্ততঃ বেড়াইতেছিলাম। এমন সময়ে অনেকটা দূরে সমুদ্রের ধারে দেখি—আগুন! দাউ দাউ আগুন! আগুন দেখিয়া আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। এমন বিজন দ্বীপে কে ওখানে আগুন জ্বালে?—ভয়ের চোটে আমি একদৌড়ে আমার বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম এবং ঘরে যাইয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম; কিন্তু এমন ভীরুর মত কাজ করিয়া নিজেরই আবার অনুতাপ হইতে লাগিল। সুতরাং সিঁড়ি ফেলিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম; তারপর আমার দূরবীণ ধরিয়া উহা দেখিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, বহুদূরে কতকগুলি অসভ্য নেংটা লোক আগুন জ্বালিয়া তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিতেছে। খাদ্যবস্তুর মধ্যে—কয়েকটা মানুষ! অসভ্যেরা মানুষগুলিকে পোড়াইয়া খাইতেছে!—নিকটেই কয়েকখানি নৌকা বাঁধা। তাহারা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ঐ নৌকায় চড়িয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল।

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম যে, আমি নিজেকে যত নিরাপদ্ বলিয়া মনে করিতাম, প্রকৃতপক্ষে আমি তত নিরাপদ্ নহি। দৈবাৎ যদি আমি ঐ অসভ্যদের চোখে পড়িয়া যাই, তবেই আমার দফা শেষ! সুতরাং আমি খুব ভয়ে ভয়ে সাবধানে চলাফিরা করিতে লাগিলাম।

একদিন আমি আমার তাঁবুতে বসিয়া আছি। বাহিরে তখন ভয়ানক দুর্যোগ—ভীষণ ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। হঠাৎ "গুড়ুম" করিয়া একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল! এমন সময়ে কে বন্দুকের আওয়াজ করে? আমি চমকিত হইয়া বাহিরে আসিলাম এবং পাহাড়ের উপর উঠিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম —ব্যাপারখানা কি? বহুদূরে—সমুদ্রের দিকে অন্ধকারে

একটা আগুনের হল্কা দেখিতে পাইলাম—সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা শব্দ হইল—"গুড়ুম্!"

এইবার বেশ পরিষ্কার বুঝিলাম যে, কোন জাহাজ বিপদে পড়িয়া সাহায্যের জন্য এমন সঙ্কেত করিতেছে। আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অনেকদিন আগে আমার উপর দিয়া যে এই রকমই একটা বিপদ চলিয়া গিয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ আমি এমন অসহায়—এসব কথা নিমেষের মধ্যে আমার বুকের মাঝে উদয় হইল; কিন্তু অমন অসহায় অবস্থায় আমি আর তাহাদিগকে কি সাহায্য করিতে পারি? বরং,—ঈশ্বরের কৃপায় জাহাজটি যদি কোন রকমে বাঁচিয়া যায়, তবে হয় ত আমারই কোন উপকার হইতে পারে। সুতরাং আমি যে এখানে একটা মানুষ একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়িয়া আছি, ইহা বুঝাইবার জন্য আমিও একটা সঙ্কেত করিলাম—খড়কুটা একত্র করিয়া প্রকাণ্ড একটা আগুন জ্বালিলাম।

সেই সময় একবার বিদ্যুৎ ঝল্‌সিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের সেই আলোকে মনে হইল যেন বহুদূরে কোন জাহাজের একখানি অস্পষ্ট ছবি।

জাহাজের লোকেরাও বোধহয় আমার সঙ্কেত বুঝিল—কারণ তখনই আবার কয়েকটা বন্দুকের শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি সেই আগুন জ্বালিয়া রাখিলাম—কিন্তু আমাকে উদ্ধার করিতে কেহই আসিল না, জাহাজের কোন খোঁজ-খবরই পাইলাম না।

ভোর হইল—চারিদিক সূর্য্যের আলোয় ঝক্‌-ঝক্‌ করিয়া উঠিল। দেখিলাম, প্রকাণ্ড একখানি জাহাজ দ্বীপের পূবদিকে সমুদ্রের মধ্যে জলে-ডুবা পাহাড়ে লাগিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে! জাহাজখানির পরিণাম দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল। হায়! কত শত হতভাগার জীবন যে চিরদিনের জন্য এই অতল সমুদ্রে বিসর্জ্জিত হইল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

ইহার দু'-এক দিন পরে ছোট্ট একটি বালকের মৃতদেহ ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রের চড়ায় আসিয়া লাগিল। তাহার জামার পকেটে কয়েকটি টাকা ও একটি সিগারেটের নল পাইলাম। টাকা কয়টি পাইয়া আমার যত আনন্দ হইল, সিগারেটের নল পাইয়া আমার আনন্দ হইল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভৃত্য-লাভ

ঐ ঘটনার পর অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। একদিন গভীর রাত্রিতে আমি আমার তাঁবুতে বসিয়া আছি, নানারকম চিন্তা আসিয়া উঁকি-ঝুঁকি দিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা ভাবনা আসিয়া বড়ই অস্থির করিয়া ফেলিল। ভাবিলাম, আমার মত একা মানুষের পক্ষে এখান হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া কখনও সম্ভবপর নহে; কিন্তু যদি ঐ অসভ্যগুলির একটাকেও ধরিতে পারি, তবে হয় ত তাহার সাহায্যে পথ চিনিয়া কোন বড় নৌকায় চড়িয়া আবার আমার দেশের দিকে ফিরিতে পারিতাম। —ভাবিতে ভাবিতে মনে মনে একটা সঙ্কল্প করিলাম, যাহাই কেন ঘটুক্ না, অসভ্যদের একটাকে ধরিতেই হইবে।

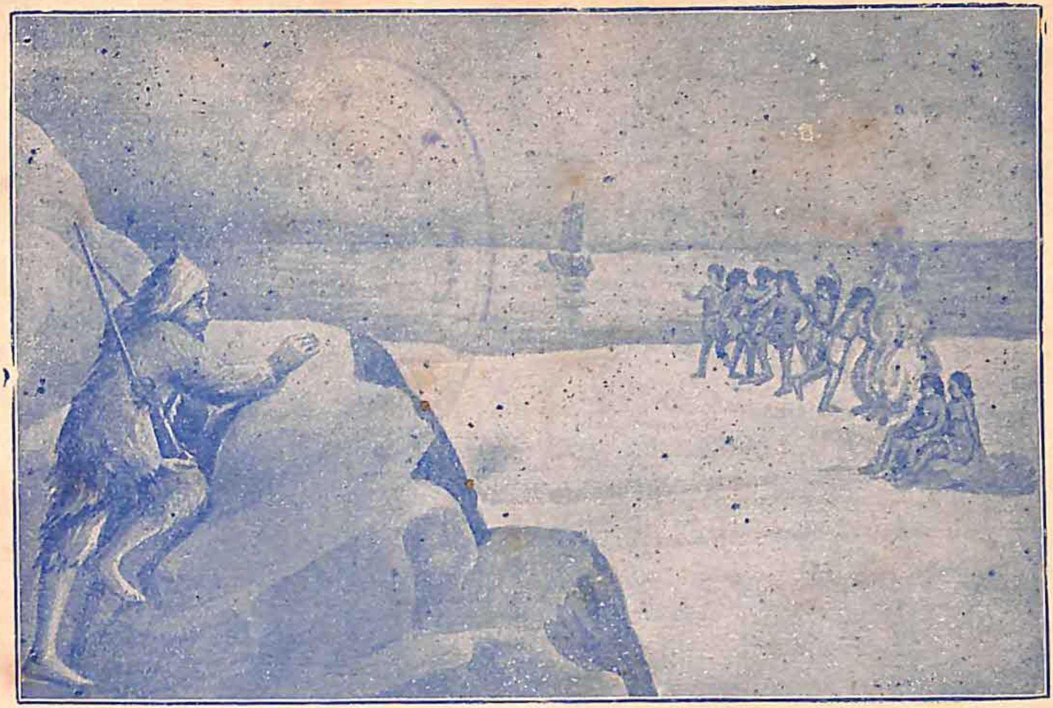
পূরাপূরি একটি বছর কাটিয়া গেল। অবশেষে একদিন দেখিলাম আমার তাঁবুর অনতিদূরে পাঁচখানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। এক একখানা নৌকায় চারি-পাঁচজন করিয়া মানুষ হইলে পাঁচটি নৌকার লোক-

সংখ্যা ত নিতান্ত কম নহে! ইহাদের সকলের সঙ্গে যুঝিয়া দু'-একটিকে বন্দী করা কি আমার মত একা লোকের পক্ষে সম্ভবপর?—ইহা ভাবিয়া আমি একটু হতাশ হইয়া পড়িলাম।

যাহোক্, বেশীক্ষণ সেইভাবে কাটাইলাম না। আমি গোলাগুলি ভরিয়া আমার বন্দুকগুলি বেশ করিয়া সাজাইয়া রাখিলাম, তারপর অতি কষ্টে পাহাড়ে উঠিয়া গোপনে তাহাদের হালচাল লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, অসভ্যগুলি একটা অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে খুব নাচের ধূম লাগাইয়াছে। নিকটেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দুইটি হতভাগা পড়িয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে অসভ্যদের একজন উঠিয়া ঐ লোক দুইটির কাছে গেল এবং তাহাদের একজনের মাথায় প্রকাণ্ড একটি মুগুর দিয়া দম্ করিয়া এক ঘা বসাইয়া দিল। হতভাগার চীৎকারে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। অসভ্যেরা তাহার মাংস কাটিয়া কাটিয়া আগুনে পোড়াইয়া খাইতে লাগিল।

তাহারা যখন ঐরকম আমোদে মত্ত, তখন অপর বন্দীটি আমার দিকে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।



দেখিলাম, অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে নাচের ধুম লাগাইয়াছে

[পৃঃ ৬৮

আমি ভাবিলাম, এখন যদি অসভ্যদের সকলেই উহার পেছনে ছুটিয়া আসে, তবে ত মহাবিপদ্! দৈবাৎ আমাকে দেখিলে আমারও দফা শেষ! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মাত্র তিনটি অসভ্য ঐ হতভাগার অনুসরণ করিল। তাহাদের মধ্যে কেহই ঐ লোকটির সঙ্গে দৌড়াইয়া পারিতেছিল না।

লোকটি দৌড়াইতে দৌড়াইতে এমন একটা জায়গায় আসিল যে, সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া না পড়িলে সে কিছুতেই রক্ষা পাইত না। অসভ্যদের মধ্যে দুইজন সাঁতার জানিত, তাহারাও উহার পেছনে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আমি দেখিলাম এই একমাত্র সুযোগ। ঐ হতভাগাকে বাঁচাইতে হইলে আর দেরী করা চলে না। আমি মই দিয়া নীচে নামিয়া পড়িলাম এবং সোজাপথে তাহাদের কাছে যাইয়াই বন্দুকের গুলিতে একটাকে শেষ করিয়া দিলাম। হঠাৎ এই ব্যাপারে তাহারা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল; কিন্তু একজনকে মরিতে দেখিয়াও অপর লোকটি কিছুমাত্র দমিল না। সে তাহার ধনুকে তীর সংযোগ করিল। আমি তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাকেও বধ করিয়া ফেলিলাম।

তিনটির মধ্যে দুইটি খুন হওয়ায় অবশিষ্ট লোকটি ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল—সে ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল এবং ইসারায় তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিল ; আমি তাহাকে মারিলাম না, তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলাম এবং তাঁবুর দিকে লইয়া গেলাম। সেখানে তাহাকে রুটি, কিশ্‌মিশ্‌ ও পরিষ্কার জল খাইতে দিলাম। সে তাহা খাইয়া ভারী খুশী হইল এমন বুঝিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পরে ইঙ্গিতে তাহাকে শুইতে বলিলাম। সে শুইতে গেল এবং শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

যে-দিন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল সে-দিন ছিল ফ্রাইডে (অর্থাৎ শুক্রবার)। ফ্রাইডেতে ধরিয়াছিলাম বলিয়া আমি ঐ অসভ্যটির নামও রাখিলাম 'ফ্রাইডে'। সুতরাং ইহার পর হইতে আমি তাহাকে ফ্রাইডে বলিয়াই সম্বোধন করিতাম।

ক্রমশঃ তাহাকে একটু একটু আমার দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলাম। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুলিতে কথা বলিতে শিখিল এবং জামা-কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে আমার নূতন চাকর ফ্রাইডে ক্রমশঃ অনেকটা সভ্যতার পথে অগ্রসর হইল। তথাপি

অনেকদিন পর্য্যন্ত আমি খুব সাবধানেই ছিলাম। কারণ, মনে মনে বড়ই ভয় হইত, কি জানি কখন সুযোগ পাইয়া আমাকেই বা খাইয়া ফেলে! মানুষের মাংস খাইবার লোভ যে তাহার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ছিল তাহা একদিনের ব্যাপার দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম!

অনেকদিন আগে যেখানে তাহারা একদিন মানুষ পোড়াইয়া খাইতেছিল, সেইখানে আর একবার ফ্রাইডেকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে তখনও দুই-চারিটি হাড় পড়িয়া ছিল, তাহাতে সামান্য সামান্য মাংসও লাগিয়া ছিল। তাহা দেখিয়াই ফ্রাইডের লোভ হইয়াছিল বুঝিলাম। কিন্তু আমি বন্দুক উঁচু করিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া বলিলাম—"খবর্দ্দার! আর যদি কখনও মানুষের মাংস খাইবার লোভ হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে গুলি করিব।" ইহাতে ফ্রাইডে বড় লজ্জিত হইল ও দমিয়া গেল।

তবু—অসভ্য জাতি—বিশ্বাস নাই, এই মনে করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহাকে আমার ঘরেই শুইতে দিতাম না, অন্যত্র শুইতে দিতাম। ভয় হইত, কি জানি সুবিধা পাইয়া রাত্রিতে আমার ঘুমন্ত অবস্থায়ই যদি আমার একখানি ঠ্যাং চিবাইতে আরম্ভ করে তবে ত মহাবিপদ্।

যাহোক্, ক্রমশঃই বুঝিলাম যে, তাহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই নাই ; কারণ সে আমার নিতান্তই অনুগত হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় আমি তাহাকে মাঝে মাঝে রান্নাকরা সুসিদ্ধ মাংস খাইতে দিতাম। তাহা খাইতে সে খুব ভালবাসে এ-রকম ভাব প্রকাশ করিত। ক্রমশঃ সে তাহাতে এমন অভ্যস্ত হইয়া গেল যে, একদিন সে আমাকে জানাইল, সে আর কখনও মানুষের মাংস খাইবে না, এ-রকম মাংসই তাহার খুব ভাল লাগে। আমিও ভারী খুশী হইলাম।

———

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষুদ্র যুদ্ধ

ফ্রাইডের সঙ্গে মাখামাখি ভাবটা আমার ক্রমশঃই খুব বাড়িয়া উঠিল। কারণ, আমি দেখিলাম, অসভ্য জাতি ত দূরের কথা, সভ্য জাতির মধ্যেও এমন বিশ্বাসী চাকর আর দুটি মিলে না। সে আমার মনস্তুষ্টির জন্য দিনরাত্রি পরিশ্রম করিত, আমাকে কোন কাজই করিতে দিত না।

আমি তাহাকে ধীরে ধীরে অনেক কথাই বলিলাম। ইউরোপের কথা, বিশেষতঃ আমার জন্মভূমি ইংলণ্ডের কথা, নানা দেশ-বিদেশের কথা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা ইত্যাদি নানা কথাই তাহাকে বলিলাম। আমি যে কি-রকম ভাবে বিপদে পড়িয়া কত বৎসর আগে কেমন করিয়া এই বিজন দ্বীপে আসিয়াছিলাম, এসব কথাও তাহাকে বলিলাম। শুনিতে শুনিতে ফ্রাইডে তন্ময় হইয়া যাইত, তাহার চক্ষুদুইটি জলে ভরিয়া আসিত; বুঝিতাম তাহার বুকখানি সহানুভূতিতে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। আবার কেমন করিয়া আমি আমার স্বদেশে

ফিরিয়া যাইতে পারি এসব জল্পনা-কল্পনা করিবার কালে ফ্রাইডেও মাঝে মাঝে দুই-একটি উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিত। আমার জন্য ফ্রাইডের এতটা দরদ—এতটা ব্যথা দেখিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতাম।

একদিন কথায় কথায় ফ্রাইডে আমাকে বলিল যে, আমার মতন সতেরোটি শাদা মানুষ একবার তাহাদের দেশে যাইয়া পড়িয়াছিল—সেই হইতে তাহারা সেইখানেই আছে। আসিবার দিনও ফ্রাইডে তাহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছে বলিল। অসভ্যেরা তাহাদের কোন অনিষ্টই করে নাই, বরং খাওয়া-দাওয়ার জিনিসপত্র দিয়া বেশ আরামেই রাখিয়াছে।

কথাটা শুনিবার পর হইতে আমার মনটা কেমন হইয়া গেল। কারণ, স্বাধীনতা-বিহীন হইয়া শত-সহস্র সুখাদ্যে বেষ্টিত থাকিলেও তাহা যে কি আরাম, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারি; সুতরাং, কিরূপে তাহাদের সহিত মিলিতে পারিব, আমি কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

একদিন ফ্রাইডেকে বলিলাম—"ফ্রাইডে! আমি একটি নৌকা দিব, তুমি তোমার দেশে ফিরিয়া যাও।"

ফ্রাইডে কোন জবাব দিল না—খুব গম্ভীর ও বিষণ্ণ-ভাবে বসিয়া রহিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি ফ্রাইডে! তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?"

সেইরূপ গম্ভীরভাবেই ফ্রাইডে কহিল—"তুমি বোধ হয় আমার উপর খুব বিরক্ত হইয়াছ? আমি কি দোষ করিয়াছি?"

—"না, দোষের কথা কি হইল? আমি তোমার উপর বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হই নাই।"

—"তবে তুমি আমাকে বাড়ী পাঠাইতে চাও কেন?"

—"কেন? তুমি কি তোমার নিজের দেশে—নিজের বাড়ীতে যাইতে চাও না?"

"হাঁ চাই, কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও। আমি একা যাইতে চাই না।"—এ কথা বলিতে বলিতে ফ্রাইডের দুইচক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

আমি বুঝিলাম ফ্রাইডের প্রাণে খুব বেশী আঘাত লাগিয়াছে। সে যে আমাকে কত ভালবাসে,—আমাকে ফেলিয়া সে যে তাহার নিজের দেশেও যাইতে চাহে না, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। যাহোক্, আশ্বাস দিয়া আমি তাহাকে কহিলাম যে,

সে যতদিন ইচ্ছা আমার কাছে থাকিতে পারে, আমার তাহাতে একটুও আপত্তি নাই।

ইহার পর আমরা একটি বড় নৌকা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার অপেক্ষা ফ্রাইডে কাঠ ভাল চিনিতে পারিত। সে-ই একটা বড় গাছ পছন্দ করিয়া আনিল। আমরা তখন তাহা খুঁদিয়া নৌকা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় মাসখানেক অবিরাম পরিশ্রম করার পর নৌকা তৈয়ার হইল। টানাটানি করিয়া সেটিকে জলে নামাইলাম, তারপর ফ্রাইডেকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ফ্রাইডে! এই নৌকায় চড়িয়া তোমাদের দেশে যাওয়া যাইবে ত?"

সে বলিল—"হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই যাওয়া যাইবে। খুব ঝড়-তুফান হইলেও ইহার কিছুই হইবে না।"

আমরা তখন পাল, মাস্তুল ও খাদ্যদ্রব্য দিয়া নৌকাটিকে বেশ বোঝাই করিতে আরম্ভ করিলাম। একদিন সকালবেলা নৌকার সাজসজ্জা করিতে করিতে আমি ফ্রাইডেকে ডাকিয়া বলিলাম—"ফ্রাইডে! তুমি একবার সমুদ্রের ধারটা ঘুরিয়া এসো; দেখ, কোন কচ্ছপ-টচ্ছপ পাওয়া যায় কিনা। দুই-একটা পাওয়া গেলে মাংস ও ডিম খাইয়া বেশ একটু আরামে থাকা যাইবে।"

ফ্রাইডে কচ্ছপের খোঁজে চলিয়া গেল; কিন্তু অল্পদূর যাইয়াই সে খুব হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইয়া আসিল এবং আমি কিছু বলিবার আগেই সে চীৎকার করিয়া কহিল—"হুজুর! আর রক্ষা নাই, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! তিনটি নৌকা—তা' বোঝাই কেবল অনেক-গুলি অসভ্য।"

আমি তাহাকে সাহস দিয়া বলিলাম—"ফ্রাইডে! ভয় করিও না। তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর, তবে আমি ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব; তোমাকেও যুদ্ধ করিতে হইবে।"

ফ্রাইডে দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—"সে কি কথা! আমরা মাত্র দুইজন, আর উহারা যে এতগুলি!"

—"তাহাতে ভয় কি ফ্রাইডে? তুমি আমাকে সাহায্য করিও, দেখবে বন্দুকের পাল্লায় ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে কেমন করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়ে! কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিতে রাজী আছ ত?"

ফ্রাইডে সংক্ষেপে কহিল—"তুমি যদি আমাকে মরিতে বল, আমি তাহাতেও সম্মত আছি।"

আমি তখন বন্দুক ও তরোয়াল দিয়া সাজসজ্জা করিয়া লইলাম। ফ্রাইডেকেও বন্দুক এবং তরোয়াল

দিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া দিলাম। তারপর একটা গাছের আড়ালে যাইয়া লুকাইয়া রহিলাম। অসভ্যেরা আমার বাড়ীর অনতিদূরেই নৌকা হইতে নামিল, তারপর একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া তাহার চারিদিকে খুব নাচিতে আরম্ভ করিল। আগুনের কুণ্ডেরই নিকটে হাত-পা বাঁধা, দাড়িওয়ালা একজন শাদা মানুষ পড়িয়াছিল। আমি স্থির করিলাম, যেরূপেই হৌক, ইহাকে এই অসভ্যদের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবেই।

আমি ফ্রাইডেকে কহিলাম—"ফ্রাইডে! সাবধান থাকো। আমি যখন বলিব, তখন ঐ অসভ্যদিগকে গুলি করা চাই। এখন বেশ করিয়া লক্ষ্য স্থির কর।"

ফ্রাইডে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিল, তারপর আমার ইঙ্গিতমত বন্দুক ছুঁড়িল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমিও বন্দুক ছুঁড়িলাম। পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল কাঁপাইয়া শব্দ হইল—"গুম্-গুম্-গুড়ুম্!"

সঙ্গে সঙ্গে তিনজন অসভ্য মরিয়া গেল এবং আরও পাঁচজন আহত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি বন্দুক পূরিয়া আবার একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়িলাম। এবারও কতকগুলি হত ও কতকগুলি আহত হইল। অবশিষ্ট অসভ্যগুলি ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে

ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। আমরা এই অবসরে ঐ সাহেবটির বাঁধন কাটিয়া দিলাম।

অসভ্যদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সে বেচারা হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল; কিছুক্ষণ কোন কথাই বলিতে পারিল না। তারপর আমাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতে লাগিল। আমি কহিলাম—"মহাশয়! কথাবার্ত্তা যাহা আছে তাহা পরে হইবে; আপনার বিন্দুমাত্র শক্তি থাকিলেও এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন।" এই বলিয়া তাহাকেও একটা বন্দুক্‌ দিলাম। সে-ও তখন অসভ্যদের তিন-চারিটাকে মারিয়া ফেলিল।

ওদিকে ফ্রাইডে অবশিষ্ট অসভ্যগুলির পেছনে তাড়া করিয়া গিয়াছিল। তাহারা নৌকায় উঠিয়া পালাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু আমি বুঝিলাম, একবার যদি উহারা কোনরূপে পলাইতে পারে, তবে আর আমাদের রক্ষা নাই। তাহারা দেশ হইতে তিন-চারি শত লোক আসিয়া আমাদিগকে ইহার প্রতিফল দিয়া যাইবে। সুতরাং, আমি ফ্রাইডেকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম—"খবর্দ্দার! অসভ্যদের একটাও যেন পলাইতে না পারে।"

আমার বিশ্বাসী ভৃত্য ফ্রাইডে প্রাণপণে আমার হুকুম তামিল করিল। অধিকাংশ অসভ্যই তাহার

গুলির আঘাতে হত হইল, কেবল কয়েকজন মাত্র নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া গেল। লোকের অভাবে তাহাদের অনেকগুলি নৌকা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। আমি তাহাদেরই একটা নৌকায় চড়িয়া ঐ অসভ্যগুলিকে সমুদ্রের মধ্যেই আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলাম এবং সেই অনুসারে ছুটিয়া একটা নৌকায় লাফাইয়া উঠিলাম। কিন্তু তাহাতে দেখি যে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা অসভ্য তাহাতে পড়িয়া আছে! আমি ফ্রাইডেকে ডাকিয়া তাহা দেখাইলাম। ফ্রাইডে তাহাকে দেখিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিতে লাগিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ লোকটি ফ্রাইডের পিতা! পিতাপুত্রের এই মিলন দেখিয়া আমিও বড়ই সুখী হইলাম। যাহোক্, তাহারও বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাকে ও শাদা মানুষটিকে রুটি, কিশ্‌মিশ্ প্রভৃতি খাইতে দিলাম। তাহারাও উভয়েই বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল।

কথায় কথায় জানিলাম যে, সেদিনের জাহাজ-ডুবিতে ঐ সাহেবটি এবং আরও ষোলজন লোক নৌকায় চড়িয়া অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু ঐ ষোলজন লোক অসভ্যদের দেশে পড়িয়া আছে।



ফ্রাইডে আমার ইঙ্গিত মত বন্দুক ছুঁড়িল

[পৃঃ ৭৮

আমি বলিলাম—"তাহারা যদি একবার আমার এই দ্বীপে আসিতে পারিত, তবে আমরা সকলে মিলিয়া কোনরূপে একখানি জাহাজ প্রস্তুত করিয়া পলাইতে পারিতাম।"

শাদা মানুষটি কহিল—"ঐ লোকেরা তাহা নিশ্চয়ই করিত; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সেরূপ যন্ত্রপাতি কিছুই নাই, বিশেষতঃ তাহারা বড়ই ভয়ে ভয়ে কাল কাটাইতেছে।"

আমার কাছে যন্ত্রপাতির অভাব ছিল না, দ্বীপে কাঠের অভাবও ছিল না। সুতরাং ভাবিলাম, একবার আনিতে পারিলে একটা ব্যবস্থা করা যাইবেই। এই ভাবিয়া উহাদিগকে আনিবার জন্য ফ্রাইডের পিতা ও ঐ সাহেবটিকে পুনরায় অসভ্যদের দেশে পাঠাইয়া দিলাম। বলা বাহুল্য প্রচুর পরিমাণে খাবার ও গুলিবারুদসহ বন্দুক দিতে ত্রুটি করিলাম না। যাত্রার পূর্ব্বে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলাম, তাহাদের যেন কোন বিপদ্ না ঘটে। অনুকূল বাতাসে পাল উড়াইয়া নৌকাখানা ফ্রাইডের পিতা ও সাহেবটিকে লইয়া অসভ্যদের দেশে ছুটিয়া চলিল।

অষ্টম অধ্যায়

উদ্ধার

ঐ ঘটনার অনেকদিন পরে—আমি যখন ঘুমাইয়া ছিলাম এমন সময়—ফ্রাইডে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"হুজুর, তাহারা আসিয়াছে! ঐ দেখুন তাহারা আসিয়াছে!"

আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া ধড়্ফড়্ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া দেখি, একটি লম্বা ছিপ্নৌকা তীরের দিকে আসিতেছে, আর তাহার পেছনে কিছুদূরে প্রকাণ্ড একটি জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে।

জাহাজখানি দেখিয়াই আমার দেশীয় জাহাজ বলিয়া মনে হইল, অসভ্যদের দেশ হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। আমি তাড়াতাড়ি ফ্রাইডেকে কহিলাম—"শীগ্গির এইদিকে আসিয়া পড়। তোমাকে যেন কেহ দেখিতে না পায়। আমরা যে নৌকার আশায় আছি, ইহা সেই নৌকা নহে।"

তখন আমরা দুইজনেই একটা ছোট পাহাড়ের পেছনে লুকাইয়া উহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

নৌকাখানি তীরে আসিয়া লাগিল—ভিতর হইতে এগারো জন ইংরেজ নামিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে তিনজনের হাত-পা বাঁধা। বন্দী তিনজন অন্য সকলের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া দয়া ভিক্ষা করিল; কিন্তু তাহারা ইহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না, তাহাদিগকে ঐখানে ফেলিয়া রাখিল এবং নিজেরা দ্বীপটি দেখিবার উদ্দেশ্যে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বাহির হইল; অবশেষে বেড়াইতে বেড়াইতে ক্লান্ত হইয়া এক বনের মাঝে একটি গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িল।

আমি এই অবসরে ঐ বন্দীদিগের কাছে উপস্থিত হইলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা কে?"

আমার অদ্ভুত পোষাক দেখিয়া এবং আমার কথা শুনিয়া, তাহারা প্রথমতঃ বড়ই ভয় পাইল। যাহোক্, অবশেষে আমি আশ্বাস দেওয়ায় তাহারা আমাকে বন্ধুভাবে নিজেদের দুঃখের কথা বলিতে লাগিল। শুনিলাম যে তাহাদের একজন ঐ জাহাজের কাপ্তেন, ও অন্য দুইজন তাহার বন্ধু। জাহাজের নাবিকেরা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়াছে এবং অপর একজন লোককে কাপ্তেন সাজাইয়াছে। বিদ্রোহীরা ইহাদিগকে

এই বিজন দ্বীপে ফেলিয়া যাইবে, এই উদ্দেশ্যে এখানে লইয়া আসিয়াছে।

তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া প্রত্যেককে একটা করিয়া বন্দুক দিলাম এবং ঐ গাছতলায় যাইয়া বিদ্রোহীগুলিকে মারিয়া ফেলিতে চাহিলাম। কিন্তু কাপ্তেনের প্রাণটা ছিল খুব মহৎ। তিনি বলিলেন—"উহাদের সকলকে মারিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল দুইটি লোক উহাদের মাঝে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাজি—তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলেই চলিবে!"

সেই অনুসারে 'পালের গোদা' লোক দুইটিকে গুলি করিয়া অন্য সকলকে বন্দী করা হইল।

ইহার পর কাপ্তেন কহিলেন—"জাহাজে আরও অনেকগুলি বিদ্রোহী আছে—কিন্তু তাহারা দলে ভারী বলিয়া তাহাদিগকে দমন করা খুব কষ্টকর।"

এদিকে বন্দী তিনটিকে দ্বীপে ফেলিয়া অন্য লোকগুলি তখনও ফিরিয়া না আসায় জাহাজের লোকেরা খুব চিন্তিত হইল। তাহারা নিশান উড়াইয়া বন্দুকের আওয়াজ করিয়া ইহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে সঙ্কেত করিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই তখন আমাদের হাতে; সুতরাং

তাহাদের সঙ্কেতের উত্তর দিবে কে? অবশেষে কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া জাহাজ হইতে একখানি নৌকা খুলিয়া কয়েকজন লোক তীরের দিকে আসিতে লাগিল। আমি দূরবীণ দিয়া দেখিলাম যে, তাহাতে অন্ততঃ দশজন লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জাহাজ হইতে নামিল।

সমুদ্রের চড়ায় নৌকা ঠেকিতেই তাহারা সকলেই তীরে উঠিয়া আসিল এবং চেঁচামেচি করিয়া অন্য সকলকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু কাহারও কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া তাহারা বোধ হয় ভীত হইল এবং পরক্ষণেই কি বলাবলি করিয়া দুইজন লোককে নৌকার পাহারা রাখিয়া, অন্য সকলে তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টার পর তাহারা হতাশ হইয়া আবার নৌকায় ফিরিয়া যাইতেছিল এমন সময় চট্ করিয়া আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল।

আমি ফ্রাইডে ও কাপ্তেনের একটি বন্ধুকে বলিলাম—"তোমরা বহুদূরে—ঐ পাহাড়ের পেছন হইতে খুব হল্লা করিতে থাক। তোমাদের শব্দ নিজের লোকের শব্দ মনে করিয়া ইহারা তোমাদের দিকে অগ্রসর হইবে। তোমরা অলক্ষ্যে থাকিয়া ক্রমাগত শব্দ করিয়া ইহাদিগকে

পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরাইতে থাক। আমরা এই অবসরে নৌকাখানি দখল করিয়া লইব।”

পরামর্শ অনুযায়ী কাজ হইল—ঐ লোকগুলিও শব্দ লক্ষ্য করিয়া কেবল পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটিতে লাগিল এবং অবশেষে খুব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। আমরা এই সুযোগে তাহাদের নৌকাখানি অধিকার করিয়া লইলাম। তাহাতে দুইজন মাত্র লোক পাহারা ছিল; সুতরাং, তাহা অধিকার করিতে আমাদের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আমাদের ফাঁদে পড়িয়া যাহারা এতক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছিল, হয়রান্ হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। হঠাৎ আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দুইজনকে মারিয়া ফেলিলাম। ব্যাপার কি তাহা বুঝিবার আগেই কাপ্তেন চীৎকার করিয়া কহিলেন—“সাবধান! প্রাণের মায়া যদি থাকে, তবে এখনই অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং আমার কথামত কাজ করিতে প্রস্তুত হও। নতুবা এখনই কুকুরের মত গুলি খাইয়া মরিবে।”

ভয় পাইয়া তাহারা সকলেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। আমরা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া তাঁবুতে লইয়া



"তোমার দেওয়া এই প্রাণ চিরকাল তোমারই কেনা রহিল।" [পৃঃ ৮৭

আসিলাম। তারপর ঐ বন্দীদের কয়েকজনের সাহায্যে সকলে মিলিয়া জাহাজ দখল করিয়া ফেলিলাম। যে লোকটি নূতন কাপ্তেন হইয়াছিল, তাহাকে মারিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সকল গোল মিটিয়া গেল। অন্য সকলেই আমাদের অধীনতা স্বীকার করিল।

আমি অন্যান্য বন্দীদের রক্ষকভাবে দ্বীপেই ছিলাম। জাহাজ দখল করিতে আমার যাইবার আবশ্যকতা ছিল না; কিন্তু কাপ্তেনকে পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছিলাম—"জাহাজ দখল হওয়া মাত্র ক্রমে ক্রমে ছয়টা বন্দুকের আওয়াজ করিবেন।" আমি উৎকণ্ঠিতভাবে সেই আওয়াজের অপেক্ষা করিতেছিলাম। হঠাৎ 'গুড়ুম' 'গুড়ুম' করিয়া ছয়টা আওয়াজ হইল। আমি বুঝিলাম জাহাজ জয় হইয়াছে। আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম। কৃতজ্ঞভাবে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণ পরে কাপ্তেনের ডাক শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কাপ্তেন আমার হাত দুইটি ধরিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বলিলেন—"প্রাণের বন্ধু! তোমার জন্যই আজ আমার প্রাণ পাইয়াছি। তোমার দেওয়া এই প্রাণ চিরকাল তোমারই কেনা রহিল—আমি তোমার দাস মাত্র।" উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন

করিলাম—তারপর জিনিসপত্র গুছাইয়া জাহাজে উঠিয়া পড়িলাম।

বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা বেশীরকম বিশ্বাসঘাতক, তাহাদিগকে সেই দ্বীপেই ফেলিয়া যাইব স্থির করিলাম; কিন্তু তখন আমার পাতানো সংসারে তাহাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হইবার আশঙ্কা ছিল না। তাহাদিগকে চাষবাস করা, রুটি তৈয়ার করা প্রভৃতি আবশ্যকীয় সকল কাজ শিখাইয়া দিলাম। তারপর ফ্রাইডের পিতা ও সেই সাহেবটির নামে একখানি চিঠি লিখিয়া ঐ বন্দীদের কাছে রাখিয়া গেলাম। আমরা যে কি-রকম ভাবে এই দ্বীপ হইতে চলিয়া যাইতেছি তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলাম এবং স্বদেশে ফিরিয়াই আমি তাহাদিগকেও আনিবার জন্য একখানি জাহাজ পাঠাইয়া দিব ইহা অঙ্গীকার করিলাম।

একদিন শুভ মুহূর্ত্তে কাপ্তেন জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে আমি স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ আমার সেই ছাগলের চামড়ার তৈয়ারী টুপী এবং ছাতিটি সঙ্গে লইলাম। কুকুরটি আগেই মারা গিয়াছিল, কেবল তোতাপাখীটি জীবিত ছিল; আমি তাহাকে সঙ্গে লইলাম। পাল তুলিয়া জাহাজ ছুটিয়া চলিল। আমি আমার



তোতাপাখীটি হাতে লইয়া···হাসিঠাট্টায় মত্ত হইলাম [পৃঃ ৮৯

তোতাপাখীটি হাতে লইয়া কাপ্তেন ও তাঁহার বন্ধু দুইটির সঙ্গে নানারকম গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টায় মত্ত হইলাম।

সেই বিজন দ্বীপে আটাশ বৎসর দুইমাস উনিশ দিন কাটাইয়া ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে আমি আমার স্বদেশে রওয়ানা হইলাম। সর্ব্বশুদ্ধ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে—আমি প্রথম যেদিন ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, সেদিন প্রাণের মাঝে যে আনন্দ ও সুখের অফুরন্ত জোয়ার বহিয়া গেল, তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা আমার নাই। মা-বাপ আত্মীয়-স্বজনদিগের স্নেহমাখা মুখগুলি একমুহূর্ত্তে একসঙ্গে আমার চোখের সম্মুখে উদয় হইয়া বুকের মাঝে একটা ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া গেল, একটা তুফানের সৃষ্টি হইল।

রুদ্ধ কণ্ঠে—আনন্দের অশ্রুতে পরিপ্লুত হইয়া কৃতজ্ঞ-চিত্তে ভগবানকে ডাকিলাম—সারাটি প্রাণ তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল।

সমাপ্ত